পাকিস্তানে দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

পাকিস্তানে দস্যু বনহুর-৫৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

লাহোরের সব চেয়ে বড় এনং নাম করা হোটেল গুলবাগ। বিদেশী যত নামকরা লোকের আনাগোনা এই হোটেলে। হোটেলের সম্মুখে অগণিত মোটর কার দাঁড়িয়ে আছে।

অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে একটি নতুন ঝকঝকে কুইন কার এসে থামলো।

ড্রাইভ আসন থেকে ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। গাড়ি থেকে নামলো একটি সাহেবী পোশাক পরা যুবক মাথায় ক্যাপ, ঠোঁটের ফাঁকে দামী চুরুট।

গাড়ি থেকে ভদ্রলোক নামতেই দু'জন অভ্যর্থনাকারী তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

মনোরম হোটেল এই গুলবাগ। লাহোরের স্বর্গ বলে মনে হয়। ধপ ধপে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি আঠার তলা এই হোটেলটির চার পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত জায়গা। পাইন আর পাম্ গাছের বেষ্টনীতে হোটেলটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ফুলের টপ্ সাজানো। তাতে নানা রকম জানা অজানা ফুলের সমারোহ। কোন কোন জায়গায় শ্বেত পাথরে তৈরি প্রস্তর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ঝরণার পানি ঝরে পড়ছে সেই সব মূর্তির দেহের উপর। রৌদ্রের কিরণ পড়ে পানির বিন্দুগুলোকে মূর্তিগুলোর গায়ে হীরের টুকরোর মত মনে হচ্ছে।

মাঝ খান দিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেছে সুন্দর মসৃণ পথ। পথের দু'পাশে অসংখ্য ফুলের গাছ; থোকা থোকা ফুলের উপর প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মাঝে কোথাও কোথাও পাথরাসন। পাথরাসনগুলো শ্বেত পাথরে তৈরি। সম্মুখে ফোয়ারা থেকে আসনের পাদমূলে পানি ঝরে পড়ছে।

সূর্যের আলোক রশ্মি সৃষ্টি করেছে রামধনো।

অপূর্ব লাগে এ দৃশ্য।

হোটেলটির ঠিক দক্ষিণ পাশে সাঁতার কাটার জন্য পাথরে তৈরি জলাশয় বা স্নানাগার।

অনেকগুলো বিদেশী পুরুষ এবং নারী এই জলাশয়ে সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ রৌদে বসে গাটাকে গরম করে নিচ্ছে। সঙ্গিনী সহ কেউ বা হাসি তামাসায় মেতে উঠেছে। এক পাশে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছে।

ভদ্রলোক হোটেলের সামনে আসতেই দু'জন তরুণী তাকে অভ্যর্থনা জানালো। এরাও হোটেলের অভ্যর্থনাকারিনী। অভ্যর্থনাকারী তরুণদ্বয় বিদায় নিলো, এবার তরুণীদ্বয় ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে লিফটের দিকে অগ্রসর হলো।

ভদ্রলোক যে বিদেশী এবং ধনবান তাতে কোন সন্দেহ নাই। সুশ্রী সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। উজ্জ্বল দীপ্ত দু'টি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

তরুণীদ্বয় সহ লিফ্‌টে চেপে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

হোটেলের পাঁচ তলায় ১ নং ক্যাবিন বুক করা হয়েছে তার জন্য।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লিফ্‌ট পাঁচ তলায় চৌকাঠে এসে থামলো।

তরুণীদ্বয় প্রথম নেমে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তাদের পিছনে।

আবার এগুলো তারা।

তরুণীদ্বয় আগে আগে চলেছে।

তাদের দু'জনাকে অনুসরণ করছেন ভদ্রলোক।

এবার তরুণীদ্বয় ১ নং ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো।

তরুণীদ্বয়ের একজন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ডাকলো—আসুন।

ভদ্রলোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বড় সুন্দর মনোরম ভিতরটা। ফিকে গোলাপী রং পাথর বসানো দেয়াল। পর্দাগুলোও ফিকে গোলাপী। এমন কি বিছানার চাদর, বালিশের কভার সব একই রং এর।

ভদ্রলোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন।

তরুণীদ্বয় তখনও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে।

ভদ্রলোক এবার ফিরে তাকালেন তরুণীদ্বয়ের মুখের দিকে। এতোক্ষণ তিনি তেমন করে লক্ষ্য করেন নাই এবার দেখলেন তরুণীদ্বয় সুন্দরী বটে।

বয়স বাইশ বছরের বেশি নয়। মাথায় কোকড়া লালচে চুল রেশমের মত লাগছে। পরনে শাড়ি কিন্তু বড় আট সাট করে পরানো।

ভদ্রলোক বললেন—তোমরা এখন যেতে পারো।

তরুণীদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক মাথায় ক্যাপটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখলেন, দেহখানা এলিয়ে দিলেন সোফায়।

ড্রাইভার ততক্ষণে তার স্যুটকেসটা এনে রেখে গেছে।

এক সময় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, চুরুটটা এ্যাস্ট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে টাই খুলে ফেললেন তারপর কোট-প্যান্ট জামা। পরে নিলেন বিশ্রামের পোশাক।

এবার ভদ্রলোক বাথ রুমে প্রবেশ করলেন।

বাথ রুম থেকে বের হতেই দু'জন বয় তার কক্ষেই খাবার টেবিলে খাবার রেখে গেলো। যদিও অন্যান্যদের বেলায় এ নিয়ম নয় তবু ভদ্রলোকের জন্য পৃথক ধরনের ব্যবস্থা।

খাবারের মধ্যে ফলমূলই বেশীর ভাগ।

ভদ্রলোক তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছে খাবার টেবিলে বসলেন।

খেলেন তিনি। তবে ফলমূলটাই বেশি তাকে তৃপ্তিদান করলো।

এবার হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, রাত ন'টা বিশ মিনিট।

শরীরটা এলিয়ে দিলেন কোমল গোলাপী বিছানায়। চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক। চিন্তিত মনে ধূমপান করছেন। একরাশি ধোয়া কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক করছে তাঁর চার পাশে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো।

পদ শব্দে মুখ তুলতেই দেখলো ভদ্রলোক, একটি অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার এক থোকা গোলাপ।

ভদ্রলোক ফিরে তাকাতেই ফিক্ করে হেসে উঠলো তরুণী তারপর গোলাপের তোড়াটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ভদ্রলোক ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে বললেন—ধন্যবাদ।

তরুণী পূর্বের ন্যায় হেসে বললো—শুভরাত।

কথাটা বলার সময় তরুণী আরও দু'পা সরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। তার দেহ থেকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে কক্ষ মধ্যে। ভদ্রলোক চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেন না, তরুণীর দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা

তীব্র আকর্ষণ ছিলো। কিছুক্ষণ নির্বাক নয়নে উভয়ে তাকিয়ে আছে উভয়ের দিকে।

সম্বিৎ ফিরে আসে ভদ্রলোকের, হেসে বলেন তুমি যেতে পারো।

তরুণীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। এ উপেক্ষা তার জীবনে যেন প্রথম। ধীরে ধীরে তরুণীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো। চোখ দুটো যেন চক চক করছে তার। তবু বললো তরুণী—ঐ যে সুইচ্ দেখছেন ওটা টিপলেই আমি আসবো। যদি কোন প্রয়োজন মনে করেন ডাকবেন।

ভদ্রলোক স্বাভাবিক কণ্ঠে হাস্য উজ্জ্বল মুখে বললেন—ডাকবো।

তরুণী তার জুতোর হিলে খুট খুট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায় তারপর গোলাপী চাদর খানা বিছিয়ে নিলেন নিজের শরীরের উপর।

❑

হোটেল গুলবাগের এগারো তলার একটি কক্ষে কয়েকজন লোক বসে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। কক্ষের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

রাত তখন কমপক্ষে অনুমান দুটো হবে।

একজন অপর জনকে বললো—কতকগুলো বাঙ্গালীকে আজ তোমরা বন্দী শিবিরে আনতে সক্ষম হয়েছো ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললো—বিভিন্ন এলাকা থেকে ত্রিশজন পুরুষ আর আট জন মহিলা আমার বন্দী শিবিরে এনেছি। আগে আনা ছিলো দেড়শো জন।

প্রথম ব্যক্তি বললো—আগের বন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে কতজন মহিলা আছে?

বললো অপর একজন—মহিলা ছিলো পঁচিশ জন। বললো প্রথম ব্যক্তি—আরও বারো জন পুরো করে নাও তারপর চালান দেবো। হাঁ শোন অকেজো বয়সীদের........হাত দিয়ে কিছু ইংগিতে বুঝিয়ে দিলো।

ইয়াসিন চোখ দিয়ে ইশারা করে বললো—তা আর বলতে হবে না আলী সাহেব। আগেরগুলো বাছাই করে সব অকেজোগুলোকে খতম করে দেওয়া হয়েছে।

আলী সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললো—ঠিক্ করেছো। তারপর আপন মনে বললো সে—সমস্ত পাকিস্তানে একটি বাঙ্গালী বাচ্চাকে জীবন্ত

রাখবোনা আমরা। তবে কিছু কিছু পয়সা যাতে আসে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠে।

আলী সাহেব রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে বলে——হ্যালো আমি আলী জাফরী বলছি......হাঁ হাঁ আমরা ঠিক্ মতই কাজ করছি স্যার......হাঁ সমস্ত পাকিস্তানে আমাদের লোক কাজ করছে......তবে খুব হুঁসিয়ারের সঙ্গে......কাজ করতে হচ্ছে......জ্বি হাঁ......জ্বি হাঁ......না না এসব ব্যাপার বাইরে......জ্বি বুঝতে পেরেছি......বাইরের রাষ্ট্র মোটেই টের পাবেনা...... আমাদের লোক খুব সাবধানে কাজ করছে...... আচ্ছা......হ্যালো......চালান দেবো......জাহাজ খানা করাচী "ড্রাইডক" বন্দরে থাকবে......জি হাঁ মনে থাকবে......আচ্ছা আচ্ছা......সব খেয়াল থাকবে......স্যার......রাখবো স্যার......আচ্ছা......

রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসে আলী জাফরী। একটু বিশ্রাম নিয়ে বলে—তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কে আমার সঙ্গে কথা বললো?

সকলের পক্ষ হয়ে বললো—ইয়াসিন জ্বি হাঁ বুঝতে পেরেছি। আমাদের সরকারের প্রধান অধিনায়ক......

এ সব কথা বার্তা উর্দূতে হচ্ছিলো। এরা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী লোক। এক একজনকে ধনকুবেরু বলে মনে হচ্ছে। পা জামা পাঞ্জাবী সেরোয়ানী পরা, মাথায় টুপি আছে কারো কারো।

আলী জাফরীর মুখে চাপ দাড়ি কপালে নামাজের কালো দাগ, চোখে সুরমার রেখা। দাঁতগুলো পানের রসে লালে লালে কালচে হয়ে উঠেছে।

এবার হাসলো আলী জাফরী, বললো—বাস্ থাক্ আর বলোনা। জানো তো দেয়ালেরও কান আছে।

জানি আলী সাহেব। বললো ইয়াসিন।

এবার আলী সাহেব বললো—তোমরা লাহোর বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালীদের কাঁসুর শিবিরে নিয়ে আসবে; সেখানে পুরুষদের বাছাই করে শুধু মেয়েদের নিয়ে করাচী ড্রাইডক বন্দরে দুই নম্বর ফ্লাটে যাবে। এবার আলী সাহেব ওদিকে চুপ করে বসে থাকা একজনকে লক্ষ্য করে বললো— আবদুল্লা।

নড়ে বসলো লোকটা। বললো সে—বলুন আলী সাহেব?

তোমার কাজ কেমন চলছে বললে না তো?

আবদুল্লা তার কর্কশ গলায় বললো—আমি ঠিক্‌ভাবে কাজ করছি। প্রত্যেকটা বাঙ্গালীর বাড়ি থেকে আমি সপ্তাহে একজন করে সরিয়ে নিচ্ছি এবং তাদের ঝাঁজরী বন্দী শিবিরে এনে বাছাই করে বিভিন্ন শিবিরে পাঠানো হচ্ছে।

আলী জাফরী এবার আর একজনকে লক্ষ্য করে বললো—ইয়াকুব তোমার খবর কি?

আমার খবর ঠিক্‌ আছে সাব। বললো ইয়াকুব।

দিনে কতগুলোকে তুমি খতম করছো? বললো আলী জাফরী।

একটু ভেবে নিয়ে ইয়াকুব তাচ্ছিল্যতার সঙ্গে বললো—প্রতিদিন দশ থেকে বিশজন পর্যন্ত চলে। বড় শয়তান বেয়াঁদব বাঙ্গালী আদমী। বড় কান্না কাটা করে......

তোমার বুঝি খুব মায়া হয়?

মায়া হবে আমার? আলী সাহেব আমি দিনে আরও বহুৎ কাজ করতে পারি কিন্তু লোক পাইনা তো, কাদের জবাই করবো?

সাবাস। বড় আচ্ছা লোক তুমি। বহুৎ বখশীস্‌ মিলবে। বললো আলী জাফরী।

সে দিনের জন্য বৈঠক ভঙ্গ হলো।

❑

করাচী ড্রাইভ।

দু'নম্বর জেটি।

রাত তখন গভীর। একটা জমকালো জাহাজ দু'নম্বর জেটি থেকে ছাড়লো। রাতের অন্ধকারে জাহাজখানার নাম দেখা না গেলেও জাহাজখানার একটা নাম আছে।

জাহাজ খানার নাম শাহান-শা।

হীরু বন্দর ছেড়ে জাহাজ শাহান শা ধীরে ধীরে গভীর পানির দিকে ভেসে চলেছে জাহাজ খানা একটি মালবাহী জাহাজ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জাহাজ খানা জেটি ত্যাগ করবার পূর্বে অন্যান্য জাহাজের মত ভোঁ দেয় নাই। নীরবে ভেসে যাচ্ছে শাহানশা। জাহাজের সম্মুখে ডেকে দাঁড়িয়ে আলী জাফরী, আবদুল্লা ইয়াকুব আরও দু'তিন জন।

অনূকারেও আলী জাফরীর দাড়ি ভরা মুখখানাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পান সে এখনও চিবুচ্ছে।

একজন বললো—আলী সাহেব বন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশ জন সামরিক অফিসার আছে। এদের কি খতম করে পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে?

আলী সাহেব রাগত কণ্ঠে বললো—এককথা তোমাদের বার বার বলতে হয় চিশতী। শাহান শা সবে তো জেটি ত্যাগ করলো। চলতে দাও সব হবে। আচ্ছা আবদুল্লা?

বলুন আলী সাহেব।

কতগুলো মেয়ে আজ এ জাহাজে আছে?

পঞ্চাশ জন মেয়ে লোক আছে।

মোটে পঞ্চাশ?

হাঁ। গত কয়েক দিন আগে প্রায় পাঁচ শো মেয়ে মানুষ আমরা চালান করেছি।

ইয়াকুব বলে উঠলো—করাচী বন্দর থেকে ঐ জাহাজ খানা রওয়ানা দিয়েছে কিন্তু এখনও পৌঁছানোর সংবাদ পাইনি। মালিক আবু তাহের পাঁচ শো মেয়ে মানুষের জন্য তিনি দু'লাখ দেবেন কথা হয়েছে।

আলী জাফর বললো—সবগুলি কি তরুণী ছিলো?

ইয়াকুব জবাব দিলো—ঠিক্ বলতে পারছিনা আলী সাহেব।

গর্জে উঠলো জাফরী—তা পারবে কেনো। বলেছি সব সময় সূক্ষ্মভাবে কাজ করবে। যখন এদের চালান দেবে তাদের হিসাব নিকাশ ঠিক রাখবে।

চিশতী বলে উঠলো—আলী সাহেব আর কতদিন এ ব্যবসা চলবে? বাংলাদেশের লোকজন বহুৎ ক্ষেপে গেছে। তারা পাগলের মত চিৎকার শুরু করেছে আত্মীয় স্বজনদের জন্য.......

অন্ধকারে আলী জাফরীর হাসির শব্দে জাহাজটা ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো—বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের চিৎকার করে গলা ফাটাতে দাও। পাকিস্তান থেকে একটিও বাঙ্গালীকে আমরা বাংলাদেশে যেতে দেবোনা। বাঙ্গালীরা আমাদের শুধু সর্বনাশই করেনি ওরা আমাদের

সব কিছু বরবাদ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ছিলো আমাদের সব চেয়ে বড় তাজা ব্যবসার জায়গা। বাংলাদেশে ব্যবসা করেই আমাদের পাকিস্তানের জৌলুস বেড়েছে। আমরা এখানের মানুষ এমনভাবে ফেঁপে উঠেছি আর আমাদের মাথায় ওরা কুঠার মারলো। একটা বাঙ্গালী জান নিয়ে ফেরৎ যেতে পারবেনা। হাঁ বিদেশীদের কিন্তু এ ব্যাপারে একটু জানতে দেওয়া হবেনা তাতে আমাদের পাক সরকারের বহুৎ বদনাম হবে।

চিশতীই বললো—তা যত সাবধানই আমরা হই না কেনো সব দেশ কিন্তু আমাদের আচরণ টের পেয়ে গেছে।

গর্জে উঠলো আলী জাফরী। তোমাদের বোকামীর জন্য অন্য দেশ টের পাচ্ছে বুঝলে?

চিশতী বললো—বাঃ এতোগুলো বাঙ্গালীকে আমরা তাদের বাড়ি থেকে রোজ নিয়ে আসছি অথচ তারা আর ফেরৎ যাচ্ছে না......

চুপ করো। বোকামী সব বোকামী...কোন দেশ কোন রাষ্ট্র টের পাবে না। তোমরা বলবে এসো তোমাদের সবাইকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে খাবার নেই এটা নেই সেটা নেই এ সব তাল বাহানা দেখাবে।

আলী সাহেব—আপনার কথামতই তো কাজ করছি আমরা। যেমন প্রেসিডেন্ট আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খানের আদেশ মত টিক্কা খান, নিয়াজী খান, ফরমান আলী সাহেব বাংলাদেশের মানুষ নিধন যজ্ঞ শুরু করে ছিলেন আমরাও ঠিক্ তেমনি ঠান্ডা মাথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি করে কাজ করছি। এক এক সময় এক এক এলাকায় বাড়ি ঘেরাও করে গাড়িতে তুলে নিচ্ছি......

বেয়াদব এক বাড়ি থেকে সবাইকে তুলে নিচ্ছো? ধমকে উঠলো আলী জাফরী।

ইয়াকুব এবার কথা বললো—চিশতী ভুল বলছে। আমাদের সরকার তরফের যে ভাবে নির্দেশ হয়েছে ঠিক্ ঐ ভাবেই কাজ চলছে।

চিশতী বলে উঠলো—সরকার নির্দেশ দিয়ে দিলেন শুধু পুরুষদের সরাবেন কিন্তু আপনি যে মেয়েদের নিয়ে গোপনে ব্যবসা করছেন এটা কেউ জানে না।

আমি তা বলছিনা, বলছি এক বাড়ি থেকে একদিনে বেশি নেবেনা এতে পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা সবাই টের পাবে তা ছাড়া কথাটা অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রচার হয়ে যাবে। জানো এতো পাকিস্তানের কত বদনাম হবে?

চিশতী অন্ধকারেই একটু হেসে বললো—বদনাম! আলী সাহেব আপনি কি যেন বলেন। কার এতো বড় সাহস পাকিস্তানের বদনাম করে। দেখলেন না আমাদের খাঁনসেনাবাহিনী কেমন করে সোনার বাংলাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বীর বাহিনীর মত ফিরে.......না না বন্দী হলো, তবু পারলো কোন রাষ্ট্র বদনাম করতে?

চিশতী তুমি বড্ড ভুল কথা বলছো আজ। বুঝতে পারছিনা আজ তোমার কথাবার্তা এমন হয়েছে কি করে। আমি যা বললাম ঠিক্ বুঝতে পারোনি।

কে বললো পারিনি, আলী সাহেব ঠিক্ বুঝতে পেরেছি। আপনি বলেছেন এক একটা বাড়ি থেকে আকজন দু'জন করে সরাতে হবে, যেন ওরা কিছু বুঝতে না পারে, আর বলেছেন বাঙ্গালীদের খুব কষ্ট দিতে হবে মানে অভাবে ফেলতে হবে যাতে, ওরা বাড়ির মালিককে উপার্জনের জন্য বাইরে বেরুতে দেয় তখন অফিস থেকে বা রাস্তা থেকে......বাস্ এই তো?

হাঁ এতোক্ষণে সব বুঝেছো দেখছি। আলী জাফরী বললো।

ইয়াকুব বললো—আলী সাহেব আমাদের জাহাজ এখন কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে বলবেন কি?

হাঁ এখন সব বলবো। জানো তো সরকারের কড়া আদেশ কোন কথাই আগে কাউকে জানানো চলবেনা কারণ দেয়ালেরও কান আছে।

চিশতী বললো—সরকার কিন্তু যতই ব্যাপরটা গোপন রাখতে চান না কেনো সত্য কোনদিন গোপন থাকবে না। যেখানেই আমরা কথা বলি দেয়াল থাকবেই, না হলে থাকবে আলো বাতাস। কাজেই......

চুপ করো চিশতী। তুমি বড্ড আজে বাজে বকো। ক্যাবিনে চলো অনেক কথা আছে।

এগুলো আলী জাফরী।

তাকে অনুসরণ করলো তার দলবল।

জাহাজ শাহান-শা তখন বৃহৎ আকার জন্তুর মত সমুদ্র বক্ষ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। জাহাজখানা যাত্রীবাহী নয় মাল বাহী জাহাজ। নিভৃত একটি ক্যাবিনে এসে বললো সবাই।

ক্যাবিনটা জাহাজের তলদেশে তাতে কোন সন্দেহ নাই। একটা লাল রং এর আলো জ্বলছে।

আলী জাফরী একটা লোহার চেয়ারে বসে পড়লো।

অন্যান্য সবাই দাঁড়িয়ে রইলো।

দু'জন লোক দুটো কাঠের ট্রেতে করে কয়েক কাপ চা আর খাবার রেখে গেলো আলী জাফরীর সম্মুখে।

আলী জাফরী বললো—নাও চা আর খাবার খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করে নাও তারপর কাজের কথা হবে।

আলী জাফরীর কথায় এক এক জন এক একটা কাপ তুলে নিলো হাতে।

চা পর্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হলো।

আলী জাফরী দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে বললো—বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ক'জন আছে বলো ইয়াকুব?

ইয়াকুব চটপট জবাব দিলো—বিশ জন ও জাহাজে আছে।

ইয়াসিন বললো—আলী সাহেব এরা এক একটা কেউটো সাপ। যদি এরা কোনক্রমে বাংলাদেশে ফিরতে পারে তা হলে পাকিস্তানের বিপদ ঘনিয়ে আসবে সন্দেহ নাই।

সে সুযোগ কেউ পাবে না। আজ যারা শাহান-শা জাহাজে বন্দী আছে তাদের সবগুলোকে হাত পা বেধে সমূদ্রে ফেলে দিতে হবে। হাঁ ফেলে দেবার পূর্বে প্রত্যেকের চোখ দু'টোকে উপড়ে তুলে দিতে হবে।

বহুৎ আচ্ছা। বললো ইয়াসিন।

চিশতী বলে উঠলো—শুধু চোখ তুলে কি হবে আলী সাহেব হাত পাগুলোও কেটে ফেলা ভাল। কারণ কোনক্রমে যদি সাঁতরে বেঁচে যায়।

হাঁ ঠিক্ বলেছো চিশতী। ইয়াসিন সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার পূর্বে ওদের হাত পা গুলোকেও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

আচ্ছা ওস্তাদ।

বলে উঠে এবার আবদুল্লা—আমাদের জাহাজখানা এখন কোথায়, কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আলী সাহেব?

হাঁ এবার সেই কথাই বলবো।

ক্যাবিনের সবাই আগ্রহভরা চোখে তাকালো আলী জাফরীর মুখে।

চিশতী বলে উঠলো—ওস্তাদ এর আগে আমাদের যে বাঙ্গালী বন্দী চালান গেছে সে ঠিকানাটা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো আলী জাফরী—তোমার মত বেকুফ লোক নিয়ে কাজ হবেনা। এরি মধ্যে ভুলে গেছো চিশতী, আমাদের মাল কোথায় গিয়ে জমা হচ্ছে?

মানে আমার মাথাটা ইদানিং বেশি গন্ডোগোল করছে কি না—বলুন না আলী সাহেব?

আলী সাহেব পূর্বের ন্যায় রাগত কণ্ঠে বললো—ইয়াকুব তুমি বলো।

ইয়াকুব বললো—এতো বড় কথা ভুলে গেছিস্ বেটা? সব মাল গিয়ে জমা হচ্ছে গাদান বন্দরে। সেখানে বাছাই করে চালান যাবে বিভিন্ন দেশে।

আলী জাফরী বলে উঠলো—গাদান বন্দরে পৌঁছবার পূর্বে হাসনাবাদ বন্দরে।

আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করবে সেখানে কিছু বাঙ্গালী বন্দী উঠবে। হাঁ এবার বন্দী বাঙ্গালীদের দেখা যাক।

ইয়াকুব বললো- আপনি এখনও শাহান-শার আটক বন্দী বাঙ্গালীদের স্বচক্ষে দেখেনি ওস্তাদ। চলুন দেখবেন চলুন।

চিশতী বললো—ওদের এখানে নিয়ে এলেই ভাল হতো কারণ আপনার কষ্ট হবে যে ওস্তাদ।

চিশতী এই সামান্য কষ্ট আমি করতে পারবোনা মনে করো তুমি। হাসলো আলী জাফরী।

উঠে দাঁড়ালো জাফরী, বন্দীদের দেখবার জন্য পা বাড়ালো ক্যাবিনের বাইরে।

তার দল বল আবদুল্লা, ইয়াসিন, ইয়াকুব আর চিশতী তাকে অনুসরণ করলো।

জাহাজখানা ভর্তি ছিলো শুকনো মাছ।

একটা ভোটকা তীব্র গন্ধ জাহাজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাইরের লোক জানে এটা ড্রাইডকের জাহাজ এতে করে দেশ বিদেশে শুকনো মাছ চালান যায়। কে জানে শুকনো মাছের বস্তার তলায় জাহাজের খোলের মধ্যে রয়েছে অগনিত বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষ।

সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো ওরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে এসে দাঁড়ালো সবাই। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। অন্ধকার খোলের মধ্যে দু'শত বাঙ্গালী নারী পুরুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। একটা ভোটকা গন্ধ সমস্ত খোলটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেন

দম আটকে আসছে যেন। কয়েকটা ছোট্ট বালক ছিলো তারা ক্ষুধার পিপাসায় কান্নাকাটি শুরু করেছে। বন্দী বাঙ্গালীদের হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। এক এক জনের চেহারা কঙ্কালের মত হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে, চুল এলোমেলো রুক্ষ। জামা কাপড় ময়লা এবং ছেঁড়া।

আলী জাফরী সম্মুখে, পিছনে তার দলবল।

জাহাজের খোলসের মধ্যে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোতে সবার উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ইয়াকুব?

সম্মুখে সরে এসে দাঁড়িয়ে বললো—ওস্তাদ।

এদের মধ্যে নারীগুলোকে বেঁছে বের করে নাও।

আচ্ছা ওস্তাদ।

সামরিক অফিসারগুলোকে বেছে নেবো আলী সাহেব? বললো ইয়াসিন।

আলী জাফরী বললো—না এখন এদের নয়। হিন্দ বন্দরের কাছাকাছি আরব সাগরে এদের নিক্ষেপ করবে। কথাগুলো আলী জাফরী এমনভাবে বললো জাহাজের খোলের সকল বন্দীই তার কথা শুনতে পেলো।

বাঙ্গালী বন্দীদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত ভাব জেগে উঠলো। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

জাফরী বললো—ইয়াকুব মেয়েদের বেছে নিয়ে উপরে নিয়ে এসো। কথাটা বলে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে বসলো সে।

সবাই রয়ে গেলো বন্দীদের মধ্য থেকে মেয়েগুলোকে বেছে নিতে হবে।

চিশতী বললো ইয়াকুব ভাই বাচ্চাগুলো কাঁদছে কেনো?

বোকাটা জানোনা ওদের খিদে পেয়েছে।

তা আমি কেমন করে জানবো। কারণ আমার তো আর খিদে পায়নি।

তোর খিদে পাবে কেনো, ঘন্টায় ঘন্টায় খাচ্ছিস যে। পাউরুটী, চা, কফি মাংস আর ওদের তিনদিন কিছু খেতে দেওয়া হয়নি।

তিনদিন ওরা খায়নি বলো কি ইয়াকুব ভাই?

চিশতী তুই আজ কেমন যেন কথাবার্তা বলছিস্। তুই কি জানিস না? আজ নতুন এলি নাকি?

জানি তবু ভুলে যাই মাথাটা যেন আজকাল কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। শোন ইয়াকুব ভাই রাত আর বেশি নাই ভোর হলেই আমরা কাজ শুরু করবো। তখন মেয়েদের বেছে নিয়ে আলী সাহেবের সামনে হাজির করা হবে।

মন্দ বলোনি চিশতী, ভোর রাতে একটু ঘুমিয়ে নেই চলো।

ইয়াকুব ভাই আমাকে কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।

এরই মধ্যে খিদে পেলো? যাও খেয়ে এসোগে।

কিন্তু একা একা খাবো তোমরা খাবেনা?

আমাদের খিদে পায়নি।

তবে আমার সঙ্গে একটু চলোনা ভাই। দাড়িয়ে হাত বুলায় চিশতী।

ইয়াকুব রাগত কণ্ঠে বলে—আমি ঘুমিয়ে নেবো, তুমি ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

ইয়াসিন বললো—চলো আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

ইয়াসিনের কথা শুনে খুশি হলো চিশতী।

ওরা দু'জন চললো খাবার ঘরের দিকে।

চিশতী চলতে চলতে বলে—তুমি আগে আগে চলো ভাই।

কেনো রে ভূতের ভয় করছে নাকি?

হাঁ ভাই।

অমন জোয়ান বলিষ্ঠ চেহারা তার আবার ভয়। চল্ আমি আগে আগে যাচ্ছি।

এক সময় খাবার ক্যাবিনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

তখন খাবার সময় নয় বলে বাবুর্চিদল ঘুমিয়ে পড়েছে। ইয়াসিন বললো—যাও ভিতরে বসে খেয়ে নাও যা পারো।

তুমি খাবেনা ইয়াসিন ভাই?

আমি অমন পেটুক নই। তোমার খিদে পেয়েছে যাও আমি ততক্ষণে ঘুমিয়ে নেই গে। ভোর হবার আর বেশি দেরী নাই। চলে যায় ইয়াসিন।

চিশতী ক্যাবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রচুর পাউরুটি মাখন আর বিস্কুট সাজানো রয়েছে, সব দেখলো সে। তাকিয়ে দেখেনিলো চারিদিকে কেউ আছে কিনা। না কেউ নেই, ওদিকে দু'জন কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

চিশতী দ্রুত হস্তে কিছু পাউরুটি আর বিস্কুট মাখন নিয়ে একটা চাদরে বেঁধে নিলো তারপর যেমন সে বের হতে যাবে অমনি বাবুর্চিদের একজন চিশতীর পদশব্দে জেগে উঠলো। চিশতীর কাঁধে পুটলী দেখে বললো—কি হচ্ছে চিশতী ভাই এতো কি নিয়েছো? চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াতেই চিশতী পুটলী রেখে ওকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে মুখে রুমাল গুঁজে দেয় যেন সে

চিৎকার করতে না পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জেগে উঠবার আগেই চিশতী ওকে কাঁদে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করে সমুদ্রের মধ্যে। ততক্ষণে দ্বিতীয় জন জেগে উঠে হতভম্বের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। চিশতী প্রথম জনকে সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করেই দ্বিতীয় জনকে তুলে নেয় কাঁধে ওকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দেয় রেলিং এর উপর দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির মধ্যে।

এবার চিশতী পাউরুটী আর বিস্কুটের পুটলীটা কাঁধে তুলে নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বাহিরে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঠিক্ বন্দীদের ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলো।

বন্দীরা ক্ষুধায় পিপাসায় এতো কাতর ছিলো যে তাদের চোখে ঘুম ছিলোনা। তাছাড়া জানালা বিহীন বন্ধ ক্যাবিনে অসহ্য যন্ত্রনার মধ্যে কি কেউ ঘুমাতে পারে।

চিশতী ক্যাবিনে প্রবেশ করে চাপা গলায় বললো—এতো খাবার আছে আপনারা সবাই খেয়ে নিন। আমি আপনাদের হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছি।

চিশতী দ্রুত বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিলো।

বন্দী বাঙ্গালীগণ ভেবে পাচ্ছেনা এ লোকটার হঠাৎ এমন দয়া দেখাবার কারণ কি? তবে কি কোন উদ্দেশ্য আছে। এ সব খাবারে কি কোন রকম বিষ মেশানো আছে। কিন্তু বন্দীরা এতোবেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল কারো বেশিক্ষণ এ ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময় নাই। হাতের বাঁধন মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে সবাই খেতে শুরু করলো।

চিশতী নির্বাক নয়নে একদন্ড তাকিয়ে দেখলো ওরা কি ভাবে খাচ্ছে। বললো—আপনারা এমন ভাবে খাবেন যেন ক্যাবিনের মেঝেতে কিছু পড়ে না থাকে। আমি আপনাদের জন্য খাবার পানি আনছি।

বেরিয়ে গেলো চিশতী।

অল্পপরে বালতী ভরা পানি নিয়ে হাজির। চিশতী নিজের হাতে গেলাস ভরে সবাইকে পানি খাওয়ালো। তারপর আবার সবাইকে যেমন বাধা ছিলো তেমনি করে বেঁধে ফেললো। বললো—খবরদার কেউ যেন একথা প্রকাশ করবেনা।

কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো চিশতী। যাবার সময় বন্দীদের ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে গেলো সে ঠিক্ যেমন ছিল তেমনটি করে।

পূর্বাকাশ তখন সবে মাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে।

চিশতী গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়লো। অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেংগে গেলো চিশতীর। ধড়ফড় করে উঠে বসতেই ইয়াকুব বললো—একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেছে চিশতী।

অবাক চোখে তাকিয়ে বললো চিশতী—তাজ্জব ব্যাপার তার মানে?

দেখবে এসো হামিদ আলী আর করিম হোসেন সব খাবার নিয়ে উধাও হয়েছে।

বলো কি?

হাঁ! খাবার ক্যাবিনে সামান্য কিছু খাবার আছে আর সব গায়েব।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছেনা।

ইয়াসিনও বলে উঠলো—দেখবে চলো।

চিশতী বললো—আমি যখন একটা পাউরুটী খেয়ে বেরিয়ে এলাম তখন প্রচুর খাবার দেখেছি।

তুমি আর ক'টা খেয়েছো। বললো আবদুল্লা।

এবার সবাই মিলে ঐ ক্যাবিনটার মধ্যে প্রবেশ করলো, যে ক্যাবিনে প্রচুর খাবার ছিলো।

চিশতী দু'চোখ কপালে তুলে বললো—ঠিক্ হামিদ আলী আর করিম হোসেনের কাজ, না হলে এতো রুটী মাখন বিস্কুট গেলো কোথায়?

কিন্তু কেউ সাহসী হচ্ছেনা ব্যাপারটা আলী জাফরীকে জানাতে। সবাই নিজে নিজেই বলা কওয়া করতে লাগলো।

ওদিকে বেলা প্রায় আটটা বেজে চললো।

আলী জাফরীর নাস্তা খাবার সময় হয়ে গেছে। বার বার একে ওকে ডাকা ডাকি করে হয়রান পেরেশান। কেউ আসছেনা ব্যাপার কি, রেগে আগুন হয়ে নিজেই সে এগুলো। খাবার ক্যাবিনের কাছে এসে সব শুনে চক্ষুস্থির। এতো খাবার গেলো কোথায় এবং বাবুর্চি দু'জনই বা কোথায় উঠে গেলো। এটা তো শুকনো পথ নয় যে পালিয়েছে। এখন জাহাজখানা আরব সাগরের বুকচিরে এগুচ্ছে। চারিদিকে শুধু জলরাশি থৈ-থৈ করছে।

আলী জাফরী ও তার দলবল সবাই ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো। অনেক ভেবেও কেউ কোন সমাধান খুঁজে পেলোনা। সমস্ত জাহাজ খানাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কোথাও পাওয়া গেলোনা বাবুর্চিদ্বয়কে।

খাবার ক্যাবিনে যা খাবার আছে তা বড় জোর দু'একদিন চলতে পারে কিন্তু তার পর কি হবে। আলী জাফরী ভীষণ চিন্তায় পড়লো।

সামনে কোন বন্দর নাই, দু'দিন তাদের সম্পূর্ণ না খেয়ে কাটাতে হবে।

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটায় আলী জাফরী ঘাবড়েও গেছে কিছুটা। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে তাদের সময় লাগবে। আলী জাফরী যা খাবার আছে খুব হুশিয়ারের সঙ্গে সবাইকে ভাগ করে খেতে বললো এবং দুদিনের জন্য রাখতে বললো।

ঐদিন মনের অবস্থা ভাল না থাকায় মেয়েদের বাছাই বন্ধ রাখলো।

শয়তান আলী জাফরীকে একটা উদ্বিগ্নতা আচ্ছন্ন করে তুলেছে। যে বাঙ্গালী বন্দীদের নিয়ে সে এখন চলেছে তাদের জন্য সে বহু টাকা পাবে কাজেই এ ব্যাপারে সে একটু বিচলিত হলো বটে।

আবার রাত এলো আবার দিন হলো।

জাহাজ শাহান শা আরব সাগর পাড়ি দিয়ে হাসানাবাদ বন্দরের দিকে এগুচ্ছে।

আলী জাফরী তার সঙ্গী ইয়াকুব, আবদুল্লা, ইয়াসিন ও চিশতীকে ডেকে বললো—তোমরা এবার কাজ শুরু করে দাও। সামরিক অফিসার বিশজনকে খতম করে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারপর বন্দীদের মধ্য থেকে মেয়েদের বেছে নিয়ে পৃথক ক্যাবিনে রাখো। হাসানাবাদ থেকে আরও কিছু মাল উঠবে। পকেট থেকে একটা রিসিট বের করে মেলে ধরলো—হাসানাবাদ থেকে মাল উঠার পর এ রিসিটটা ওদের দিয়ে দিতে হবে। এতে লিখে দিতে হবে কত মাল আমরা সেখানে পেলাম।

চিশতী বললো—ওরা নগদ টাকা চাইবেনা তো?

না, টাকাটা সরকার ব্যবস্থা করবে। আমরা শুধু এই রসিদটা দিয়ে দেবো।

চিশতী করতালি দিয়ে বললো—আমাদের সরকার কত মহৎ কত হৃদয়বান। এমন সূক্ষ্মভাবে বাঙ্গালীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন যার জন্য আমরা দুটো পয়সার মুখ দেখছি!

আলী জাফরী বললো—বাংলা মুলুকে ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলো এখন পাকিস্তানী বেচারীরা দুটো খেয়ে বাঁচবো। কিন্তু খুব হুশিয়ার বাংলা মুলুকে আমাদের খাঁন সেনা-বাহিনী নেতারা যেমন ঠান্ডা মাথায় কাজ করেছে তেমনি ঠান্ডা মাথায় তোমরা কাজ করবে......

ইয়াকুব কিছু বলতে যাচ্ছিলো মাঝখানে বলে উঠলো—চিশতী জনাব আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খান তার অনুচরদের......মানে সৈন্য সামন্তদের ঠান্ডা মাথায় কাজ করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনিও আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন কাজেই ভুল হবেনা জনাব......

জনাব নয় ওস্তাদ বলো—ওস্তাদ......

হাঁ ভুল হয়েছে ওস্তাদ।

যাও তবে কাজ শুরু করো গে।

চিশতীই বলে উঠে—চোখ উপড়ে হাত পা গুলো কেটে ফেলতে হবে না ওস্তাদ?

হবে—হবে এরি মধ্যে ভুলে গেছো সব।

ইয়াকুব বলে উঠলো—চিশতী ভুললেও আমরা কিন্তু ভুলিনি ওস্তাদ।

যাও তবে।

চিশতী বললো—সকালের নাস্তাটা খেয়ে নেবার পর কাজ শুরু করবো আমরা।

তোমাদের খিদেটা যেন বেড়ে গেছে চিশতী। খাবার নেই বলেই তোমাদের বুঝি এতো খিদে পাচ্ছে। যাও খেয়ে নাও গে।

আলী সাহেব আপনার খাবারটা......বললো চিশতী।

আলী জাফরীর মনেও খাবার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো কারণ দু'দিন সেও অন্যান্যদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে কম করে খেতে হয়েছে। বললো—পাঠিয়ে দাও গে।

আচ্ছা আমিই নিয়ে আসবো।

অন্যান্য সহ চিশতীও বলে গেলো।

খাবার ক্যাবিনে প্রবেশ করে বললো চিশতী—তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে কাজেই তোমরা বসো, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসছি।

ইয়াকুব বললো—চিশতী তুমি বড্ড ভাল আদমী, যাও ভাই নিয়ে এসো।

হাঁ তোমরা সবাই এখানে সার হয়ে বসে যাও।

চিশতী ওদের সকলকে বসিয়ে দিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। অল্পক্ষণে একটা বড় থালায় পাউরুটী আর মাখন নিয়ে ফিরে এলো। রাখলো ওদের সামনে—নাও এবার তোমরা খাও আমি আলী সাহেবের খাবারটা তার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ইয়াকুব, ইয়াসিন, আবদুল্লা এরা খেতে শুরু করলো।

চিশতী বললো—দেখিস ভাই তোরা সব খেয়ে ফেলিস না যেন। আমার জন্য কিছু রেখে দিস কিন্তু।

চিশতীকে লক্ষ্য করে বললো আবদুল্লা—ঝট্ পট্ চলে আয় নইলে ফাকি পড়বি।

ওরা খেতে শুরু করলো চিশতী একটু হেসে খাবারের থালা নিয়ে ওস্তাদ আলী জাফরীর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। আলী জাফরী তখন লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে।

চিশতী বললো—খেয়ে নিন ওস্তাদ।

হুশ হলো চিশতীর ডাকে, বললো—আচ্ছা খাচ্ছি তুমি যাও।

খেতে শুরু করেন ওস্তাদ আমি নিজের চোখে দেখে যাই।

তোমাকে সাধে কি আর বেকুব বলি। খাচ্ছি-খাচ্ছি......

না ওস্তাদ খেয়ে নিন।

এবার আলী জাফরী খেতে শুরু করলো।

চিশতী মুচকী হেসে বেরিয়ে গেলো।

এখানে এসে দেখে ওর গায়ে ঢলে পড়ে আছে। আবদুল্লার গায়ে ইয়াসিন, ইয়াসিনের গায়ে ইয়াকুব। সম্মুখের থালায় একটুও খাবার নাই, সব ওরা খেয়ে ফেলেছে দেখে খুশি হলো চিশতী।

এবার চিশতী ওদের হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো মজবুত করে তারপর এক একজনকে তুলে নিয়ে আরব সাগরে নিক্ষেপ করলো অনায়াসে। ওদের সাগরে ফেলে ফিরে এলো চিশতী আলী জাফরীর ক্যাবিনে।

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলো আলী জাফরী মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাতালের মত টলছে। তার হাতে একখানা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। চিশতীকে দেখেই চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো।

চিশতী ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আলী জাফরীর মুখে।

আলী জাফরী চিশতীকে লক্ষ্য করে ছোরাসহ হাত খানা তুলতে গেলো, কিন্তু পারলোনা তার দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ক্যাবিনের মেঝেতে। একটা শব্দও বের হলোনা তার মুখ থেকে।

এবার চিশতী আলী জাফরীর হাতের শিথীল মুঠা থেকে ছোরাখানা খুলে নিলো, সজোরে বসিয়ে দিলো ওর বুকে।

রক্তের ফোয়ারা ছুটলো।

চিশতী আপন মনে বলে উঠলো—শয়তান, তুই যত পাপ করেছিস এটুকু শাস্তি তার জন্য যৎসামান্য মাত্র......এবার চিশতী জাফরীর দেহটা টেনে নিয়ে ফেলে দিলো সাগর বক্ষে।

চলন্ত জাহাজের উপর এতো ঘটনা ঘটে গেলো জাহাজের চালক ও সারেং কিছু জানতে পারলোনা। জাহাজ চলেছে।

এবার চিশতী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে, জাহাজের খোলের মধ্যে যেখানে বন্দীকরে রাখা হয়েছে বাঙ্গালী বন্দীদের।

বন্দীদের ক্যাবিনে প্রবেশ করে চিশতী দরজা সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেললো। তারপর বললো—আপনার বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, এবার সবাই বেরিয়ে আসুন।

বাঙ্গালী বন্দীগণ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। ভাবলেন এটা একটা নতুন কোন মতলব। কিন্তু পরক্ষণেই চিশতীর সেদিনের ব্যবহারের কথা মনে পড়লো। সেই তো সেদিন পেট ভরে রুটী মাখন খেতে দিয়েছিলো না হলে ওরা আজ মরে যেত। চিশতীর কথায় সবাই যেন আশার আলো দেখতে পেলো, এক এক করে বেরিয়ে এলো জাহাজের খোলের ভিতর থেকে বাইরের আলোতে।

চিশতী সবার হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিতে লাগলো—এক এক করে। পা বাঁধাছিলোনা কারো কারণ তাদের পায়ের বাঁধন জাহাজে তোলার একদিন পর খুলে দিয়েছিলো।

সবাই জাহাজের উপরে মুক্ত আকাশের তলায় সচ্ছ আলো বাতাসে এসে দাঁড়ালো। তারা প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা তারা মুক্ত। অবাক হয়ে গেছে সবাই কে এই লোক যার এতো দয়া, যে এতো মহৎ।

চিশতী বললো—আপনারা খুব বিস্মিত হয়ে গেছেন বুঝতে পারছি কিন্তু সব বলার সময় এখন নয়। মনে করুন আমি আপনাদেরী একজন বন্ধু। আর বিশ্বাস করুন আপনারা সম্পূর্ণ মুক্ত।

বাঙ্গালী বন্দীগণ জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। তারা অবাক হয়ে গেছে, ভেবে পাচ্ছেনা কি ঘটলো বা কি ঘটছে। মৃত্যুর জন্য রাত প্রহর গুণছিলো, এভাবে উদ্ধার পাবে এ স্বপ্নের মত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। খুশিতে সবার

চোখে পানি আসছে। কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চিশতীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো।

চিশতী বিব্রত বোধ করছে তবু বললো—আপনারা এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নন যতক্ষণ আপনারা কোন বিদেশে গিয়ে না পৌঁছবেন। তবে আমি আশা করি আর কোন বিপদ আসবেনা। এখন আপনাদের মধ্যে দু'জন কেউ আমাকে সাহায্য করতে হবে কারণ এখনও এ জাহাজের চালক ও সারেং শত্রু পক্ষের লোক।

চিশতীর কথায় কয়েকজন পুরুষ একসঙ্গে এগিয়ে এলো, সবাই বললো—আমরা সকলে তোমাকে সাহায্য করবো ভাই।

চিশতী হেসে বললো—এতোজনকে এখন লাগবেনা তবে যদি দরকার পড়ে তখন বলবো। আপনাদের মধ্যে দু'জন সামরিক অফিসারকে পেলে ভাল হয়।

দু'জন সামরিক অফিসার এগিয়ে এলো।

একজন বললো—কি করতে হবে বলো ভাই?

চিশতী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আসুন আমার সঙ্গে। হাঁ তার আগে আপনাদের আমি কয়েকটা কথা বলবো। চলুন ঐ ক্যাবিনটার মধ্যে চলুন।

সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, ক্যাবিনটা খুব ছোট নয় বেশ বড় সড়।

চিশতী সকলকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বটে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত হননি কাজেই আপনাদের সাবধানে থাকতে হবে। যারা আপনাদের বন্দী করে বিদেশে চালান দেবার জন্য এ জাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছিলো আমি তাদের খতম করেছি। তবে এখনও এ জাহাজের চালকরা তাদেরই লোক আছে। এরা এখনও কিছু জানেনা। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সব সময় সাবধানে এই ক্যাবিনের মধ্যে থাকবেন। আমি দু'জন সামরিক অফিসারকে নিয়ে জাহাজের ইঞ্জিনের দিকে যাচ্ছি। চালক ও সারেং দু'জনকে আমাদের আয়ত্বে রেখে কাজ করে যেতে হবে। হাঁ আমাদের জাহাজে এখন কোন খাবার না থাকায় আপনাদের কষ্ট হবে এবং আমি আশা করছি সে কষ্টকে আপনারা সহ্য করে নেবেন।

একসঙ্গে সবাই বলে উঠলো—আমরা বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি এখন সব আমরা সহ্য করবো। সব কষ্ট আমরা মাথা পেতে নেবো।

আবার চিশতী বললো—আমাদের জাহাজ আজ সন্ধ্যায় হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছবে। সেখানে পাক-সরকারের দালালরা আরও কিছু বাঙ্গালী বন্দী এ জাহাজে উঠাবে। ঐ সময়টা আমাদের অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ সময় কারণ তারা এ জাহাজের মালিক কে খুঁজবে। কিন্তু তারা তাকে পাবেনা, আমি তাকে সরিয়ে ফেলেছি। ঐ সময়টা উতরে গেলেই আপনারা নিশ্চিন্ত। বেশিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে এখন আলাপ করার সময় নাই। সামরিক অফিসারদ্বয় সহ বেরিয়ে যায় চিশতী।

চিশতী একটা নিভৃত জায়গায় এসে দাঁড়ায়। একটা শুকনো মাছের বস্তার তলা থেকে দুটো পিস্তল বের করে দু'জন সামরিক অফিসারের হাতে দিয়ে বলে—আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে নোঙ্গর করলে জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয়কে এই অস্ত্রদ্বারা আয়ত্বে রাখতে হবে। আর আমি চালিয়ে নেবো সব বুঝতে পারলেন তো?

একজন সামরিক অফিসার বললেন—সব বুঝছি। কিন্তু আবার কোন বিপদ না এসে পড়ে তাই ভাবছি।

হাঁ সে কথা মিথ্যা নয়। যাক্ আপনাদের দু'জনার নাম জানা দরকার, আমার নামটাও জেনে রাখুন—আমার নাম চিশতী। অফিসারদ্বয়ের একজন বললেন—আমার নাম আলন কাওসার।

অপর জন বললেন—আমার নাম জলিল হাফেজ।

আচ্ছা, যান এখন আপনারা বিশ্রাম করুণ গে। মনে রাখবেন সন্ধ্যার পর পরই আমাদের জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছে যাবে।

❑

জাহাজ শাহান শা হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই চিশতী বলে দিলো এবার আপনারা জাহাজের ইঞ্জিন কক্ষে যান, কোন ক্রমেই চালক ও সারেংদ্বয় যেন ইঞ্জিন কক্ষ থেকে বাইরে না আসতে পারে। আমি এদিকে চালিয়ে নেবো।

জাহাজ জেটিতে ভিড়তেই জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয় বাইরে আসবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় তারা দেখলো অপরিচিত দু'জন বাঙ্গালীলোক ইঞ্জিনের দরজায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে।

একজন বললো—খবরদার একপা নড়না—কিংবা বাইরে বেরুতে চেষ্টা করোনা।

জাহাজ শাহান শার চালক খুব বয়সী লোক ছিলো, সে সাহস করে বললো—কে তোমরা?

সারেংদ্বয় ভয় পেয়ে গেছে রীতিমত। তারা বুঝতে পারছেনা কি ব্যাপার ঘটেছে। গত সময় গুলি তার মনোযোগ সহকারে জাহাজ চালনার কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই কারণে অন্য কোন দিকে তাদের খেয়াল দেবার সুযোগ হয়নি। জাহাজে কি ঘটেছে না ঘটেছে তারা টের পায়নি। হঠাৎ দুজন অপরিচিত লোককে পিস্তল হাতে এভাবে দেখে হক চকিয়ে গেলো তারা। কেউ এগুতে সাহসী হলোনা।

ওদিকে জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে ভিড়তেই দু'জন ধনকুবেরু ধরনের লোক প্রায় ত্রিরিশজন বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষ এনে হাজির করে। তারা আলী জাফরীর সঙ্গে দেখা করে রিসিট চায়।

চিশতী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—তিনি হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কাজেই কারো দেখা করা সম্ভব নয়। সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিয়েছেন।

যারা বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষদের নিয়ে এসেছিলো তারা চিশতীর কাছে রিসিট নিয়ে বিদায় হয়। আলী জাফরীর পকেট থেকে রিসিটখানা চিশতী বের করে নিয়ে তাকে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছিলো কাজেই কোন অসুবিধা হলো না।

চিশতী কিছু খাবার এবং খাবার পানি হাসনাবাদ বন্দর থেকে সংগ্রহ করে নিলো। তারপর জাহাজ ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো সে।

জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয় বাধ্য হয়ে কাজ করে চললো। ওরা হাসনাবাদ থেকে জাহাজ ভাসালো।

বাঙ্গালী বন্দী যাদের হাসনাবাদ থেকে উঠানো হলো তাদের প্রথমে একটা ক্যাবিনে আটক করে রাখা হলো।

এবার চিশতী নিজে এসে জাহাজ চালককে পথের নির্দেশ দিয়ে বললো—গাদান বন্দরে শাহানশা যাবে না। তুমি আরব সাগর হয়ে জুনাগর অভিমুখে জাহাজ চালনা করো।

জাহাজের চালক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আলী সাহেবের নির্দেশ ছাড়া জাহাজ ছাড়বোনা।

চিশতী হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ আলী সাহেব এখন সাগরের বুকে চিরনিদ্রায় অচেতন। কিংবা হাঙ্গর কুমীরের পেটের মধ্যে গিয়ে তোলপাড় করছে......

চালক চিৎকার করে উঠলো—চিশতী এ সব তুমি কি বলছো?

হাঁ সত্যি কথা বলছি।

সামরিক অফিসারদ্বয় অবাক হয়ে চিশতীর কথাবার্তা শুনছিলো। তারা তো জানেনা চিশতী কি ভাবে তাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

একটু থেমে আবার বললো চিশতী—শুধু আলী জাফরী নয় এ জাহাজের যে কয়টা শয়তান ছিলো শুধু তোমরা তিনজন ছাড়া সবাইকে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছি। তোমরা যদি কথা না শুন তবে তোমাদের অবস্থাও তেমনি হবে।

চালক বলে উঠলো—চিশতী তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে?

চিশতীকে সবার আগেই খতম করেছি......

তুমি, তুমি কে তবে......

আমি চিশতীর প্রেত আত্মা। খবরদার কোন রকম চালাকি করতে যেওনা তা হলে তোমাদের অবস্থাও ঐ রকম হবে। চিশতীর কথাগুলো চালক ও সারেংদ্বয়ের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। তারা নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য চিশতীর কথামত কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো।

জাহাজ হাসনাবাদ বন্দর ত্যাগ করে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হলো।

পথে আর কোন বাধা এলো না। আরব সাগর হয়ে জাহাজ এবার জুনাগড়ের দিকে এগিয়ে চললো।

যে বাঙ্গালী বন্দীদের হাসনাবাদ বন্দর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিলো তাদেরকেও চিশতী মুক্ত করে দিল। মৃত্যুর জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলো কারণ তারা জানে পশ্চিমা শাষক গোষ্ঠি তাদের কিছুতেই মুক্তি দেবেনা। বেশ কিছু দিন হলো তাদের নিজ নিজ বাসা থেকে ধরে এনে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক রেখে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাদের অপরাধ তারা বাঙ্গালী।

আজ মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সবাই।

চিশতী সবাইকে খেতে দিলো।

প্রাণক ভরে খেলো সবাই।

দু'দিন দু'রাত অবিরাম চলার পর জুনাগড় পৌঁছলো জাহাজ শাহান-শা। জুনাগড় বন্দরে পৌঁছানোর পর চিশতী সবাইকে ডেকে বললো—এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে, আপনারা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিশ্চিন্ত। পাকিস্তানী হানাদারদের নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এবার আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন।

সবাই চিশতীকে প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। একজন প্রবীন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বললেন—বাবা তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

চিশতী বললো—আপনাদের দোয়া আমার কাম্য। কৃতজ্ঞতা আমি চাইনা।

জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয়কে জীবনে না মেরে ক্ষমা করে দিলো চিশতী। তবে একেবারে মুক্তি না দিয়ে জুনাগড় পুলিশের হাতে তুলে দিলো।

চিশতী সামরিক অফিসারদ্বয়কে ধন্যবাদ জানালো কারণ তাদের সাহায্য না পেলে একটু অসুবিধা হতো।

জাহাজ ত্যাগ করে সবাই নেমে গেলো।

ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে চিশতী।

চিশতী এবার ফিরে এলো, একটি ক্যাবিনে প্রবেশ করে পোশাক পাল্টে নিলো। দাড়ি গোঁফ এখন তার মুখে নেই সুন্দর দিব্যি চেহারার এক যুবক।

চিশতী পাল্টে গেলো সম্পূর্ণরূপে।

❑

লাহোর বিমান বন্দরের অদূরে সেই কালোরং-এর নতুন ঝকঝকে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করছে মালিকের।

যে বিমানটি এখন বিমান বন্দরে অবতরণ করলো সেটা ইরান থেকে আসছে।

বিমানখানা রানওয়ের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এক এক করে বিমান থেকে নেমে এলো যাত্রীগণ। সব শেষে নামলো সেই যুবক ভদ্রলোকটি। চোখে গগল্‌স হাতে এটাচী ব্যাগ।

বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে তারপর বেরিয়ে এলো বিমান বন্দরের বাইরে অদূরে থেমে থাকা গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ড্রাইভারের চোখে মুখে খুশির উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়লো।

যুবক বললো—কি সংবাদ রহমান?

সংবাদ আছে সর্দার। কথার ফাঁকে গাড়ির দরজা খুলে ধরে রহমান।

যুবক অন্য কেহ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশ হয়ে লাহোর এসে হোটেল গুলবাগে উঠেছে সে। ভদ্রলোকের বেশে সন্ধান করে চলেছে পাকিস্তানে কোথায় কি ভাবে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কোথায় কোন বন্ধী শিবিরে কতজন বাঙ্গালী আটক করে রাখা হয়েছে। কোথায় তাদের কি ভাবে চালান দেওয়া হচ্ছে।

গাড়িতে চেপে বসলো বনহুর।

রহমান ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটলো উল্কা বেগে।

রহমান বললো—সর্দার কাজ সমাধা হয়েছে?

হাঁ হয়েছে। একটা চুরুট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বনহুর।

রহমান ড্রাইভ আসন থেকেই পুনরায় প্রশ্ন করে—আপনি কি চিশতীর বেশে......

হাঁ আমি আলী জাফরীর বিশ্বস্ত অনুচর চিশতীর বেশেই কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয়েছি রহমান। প্রথম পদক্ষেপেই আমি কৃতকার্য হয়েছি। প্রায় তিন শত বন্দী বাঙ্গালীকে আমি বর্বর পাকিস্তানী দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

রহমান বললো—সর্দার কোয়েটা থেকে কায়েস ওয়ারলেসে সংবাদ পাঠিয়েছে নোরাইল, পেশোয়ার, তুখারাম সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সাগাই দুর্গে বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারীদের আটক রেখে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হু।

আপন মনে বনহুর চুরুট থেকে ধুম্র নির্গত করে চললো।

জনবহুল রাজপথ অতিক্রম করে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। পথের দু'পাশে সুউচ্চ প্রাসাদ সমতুল্য অট্টালিকা। নানা রকম মূল্যবান জিনিসের চোখ ঝলসানো দোকান পাট। মাঝে মাঝে বড় বড় ফলের দোকান, নানা

রকম ফলের সমারোহ। থরে থরে ফলগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কোথাও কোথাও পথের ধারে ছোট ছোট পার্ক, পার্কে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ তাতে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে। শ্যামল দুর্বাঘাসগুলোও সতেজ সবুজ। শুষ্ক মরুভূমির দেশে যেন স্বর্গ রচনা করেছে ওরা।

পার্কের মধ্যে পাথরাসন এবং ফোয়ারা রয়েছে। কোন কোন পার্কে পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি নারী মূর্তি কোনটি বা শিশুর প্রতিচ্ছবি।

বনহুর আপন মনে তাকিয়েছিলো বাইরের দিকে। মনে মনে গভীর চিন্তার জাল বুনে চলেছে সে।

রহমান তখন ফিরোজ খাঁ রোড অতিক্রম করে গুলবাগ হোটেলের দিকে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

গুলবাগ হোটেলে গাড়ি থামতেই রহমান ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। বনহুর নেমে পা বাড়ালো সম্মুখের দিকে।

সোজা সে লিফ্‌টে চেপে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো।

সোফায় গা এলিয়া দিলো বনহুর।

সম্মুখের টেবিলের ফুলদানীতে এক থোকা রজনী গন্ধা গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বনহুর চুরুট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলেছে। তার চুরুটের ধূম্র রাশি চার পাশে ঘুর পাক খাচ্ছিলো। পাশের কোন ক্যাবিন থেকে পিয়ানো সুমিষ্ট সুর ভেসে আসছে।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করে চলেছে।

এমন সময় দরজা খুলে গেলো, ক্যাবিনে প্রবেশ করলো সেই তরুণী, যে তরুণী গুলবাগ হোটেলের প্রথম দিন একরাশ ফুল নিয়ে রাত দশটায় তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই তরুণী একটু নত সম্মান দেখালো। আজও তার হাতে একরাশ ফুল, গোলাপ নয় গন্ধরাজ।

তরুণী ফুলের তোড়টা বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো—শুভ প্রভাত।

ধন্যবাদ।

ফুলের তোড়াটা গ্রহণ করলো বনহুর। তারপর রেখেছিলো সামনের টেবিলে।

তরুণী বললো—দেখুন মিঃ লিয়ন আপনি বড্ড নীরস মানুষ।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো—তুমি দেখছি আমার নামটাও জেনে নিয়েছো।

হাঁ হোটেলের নামের লিষ্ট দেখলেই নাম জানা যায়। কত নম্বর ক্যাবিনে কে আছেন বুঝতে কষ্ট হয়না।

বনহুর বললো—নীরস আমি কি করে বুঝলে?

সেদিনও আপনি আমার দেওয়া ফুল হাতে নিয়েই বিছানার পাশে রেখে দিয়েছিলেন, আজও আপনি এতো সুন্দর ফুল তবু নাকে দিয়ে ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন না......

ও এই কথা?

হাঁ, সত্যি আপনার আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে।

ফুল আমি ভালবাসি কিন্তু ফুলের সুগন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করেনা।

আশ্চর্য মানুষ আপনি।

এ কথা বহু নারীর মুখে আমি শুনেছি।

সেটা স্বাভাবিক কারণ আপনার মোহময় সৌন্দর্য হয়তো অনেক নারীকেই আকৃষ্ট করেছে কিন্তু......থাক আর বলবোনা।

বলো কি বলতে চাচ্ছিলে?

কিন্তু আপনাকে তারা নাগালের মধ্যে পায়নি।

হয়তো তাই। থাক্ ওসব কথা, বসো।

পাশের চেয়ারে না বসে তরুণী সম্মুখের টেবিলে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো। তার পরনে আজ আট সাট সালোয়ার কামিজ রয়েছে। বক কাটা চুলগুলো এলিয়ে পড়ে আছে কাঁধে ঘাড়ে কপালে। ঠোঁটে পুরু লিপ্‌ষ্টিক। অদ্ভুত দেহ ভঙ্গীমায় দাঁড়ালো তরুণী।

বনহুর নতুন একটা চুরুট বের করে আগুন ধরালো।

তরুণী বললো—আপনি বড্ড বেশি ধূমপান করেন বুঝি?

আমার মনে হয় বড্ড বেশি নয়।

কিছু সময় উভয়েই নীরব।

তরুণী বললো—আপনি কিন্তু এখনও আমার নাম জানতে চাননি?

জানার তেমন কোন আগ্রহ নেই বলেই জানতে চাইনি। তবে যখন প্রয়োজন বোধ করবো জেনে নেবো।

আপনার চেহারার সঙ্গে আপনার আচরণ বা কথা বার্তার কোন মিল নেই দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

চেহারাটা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে আর সবকিছু আমার আয়ত্তের মধ্যে কিনা।

আপনার সঙ্গে কথা বলে কোন.......থামলো তরুণী।

ওর কথা শেষ করলো বনহুর—আনন্দ নেই এইতো?

হাঁ।

বলেছিতো আমি যা প্রয়োজন মনে করি তাই করে যাই। যাক আমি কিন্তু খুব আনন্দ পাচ্ছি তোমার সঙ্গে কথা বলে।

সত্যি!

হাঁ।

এতোক্ষণে আপনার মধ্যে প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে।

না হলে আমাকে বুঝি প্রাণ হীন একটা দেহ মনে করছিলে?

কতকটা তাই।

আচ্ছা......এবার কিন্তু তোমার নামটা আমার প্রয়োজন হচ্ছে।

আমার নাম মিস শাম্মী......

হুঁ। আচ্ছা মিস শাম্মী এ হোটেলে তুমি কতদিন আছো?

বেশি নয়—দু'বছর।

গুলবাগ হোটেলের সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

আছে। তবে দু'এক দিনের মধ্যে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে হয়তো......

পরিচয় হয়নি এইতো?

হাঁ। কিন্তু হঠাৎ আপনি এ প্রশ্ন করলেন কেনো?

তোমার সুন্দরীর সাধক সবাই কিনা তাই......

শুধু আপনি ছাড়া।

কে বলে আমি তোমার সাধক নই?

আপনার অবহেলা উপেক্ষা আমাকে......

মিস শাম্মী উপরের আচরণই মানুষের অন্তরের কথা নয়। আসলে আমি তোমাকে উপেক্ষা করি নাই, তোমাকে যাচাই করে নিচ্ছিলাম। কারণ কি জানো?

মিঃ লিয়নের মুখে কথাগুলো শাম্মীর বড় ভাল লাগে বলে শাম্মী—কারণ আমি জানবো কি করে মিঃ লিয়ন।

তবে শুন। তুমি সবার প্রয়োজনে গিয়ে হাজির হও এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোমাকে তারা বিদায় করে দেয়। হোটেলের অন্যান্য জিনিসের মতই তোমাকে তারা ব্যবহার করে কিন্তু আমি তোমাকে সে ভাবে গ্রহণ করতে চাইনা শাম্মী। আমি তোমাকে,.....

বলুন! বলুন মিঃ লিয়ন? মিস শাম্মী মোহগ্রস্তের মত চোখ দুটো তুলে ধরে মিঃ লিয়নের মুখের দিকে। গভীর আবেগে সরে আসে সে আরও কাছে।

বনহুর হাতের চুরুট এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে দেহটাকে এলিয়ে দেয় সোফায় একটু হেসে বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি......

সত্যি!

হাঁ, ঠিক ফুলের মত......

ফুল!

হাঁ ফুল যেমন মানুষ ভালবাসে আমি তোমায় তেমনি ভালবেসে ফেলেছি।

আঃ কি মধুর কথা আপনি শুনালেন মিঃ লিয়ন। শাম্মী দু'হাত প্রসারিত করে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরতে যায়।

বনহুর আলগোছে উঠে দাঁড়ায় হেসে বলে—শাম্মী তুমি অপূর্ব.....একটু থেমে বলে—শাম্মী?

বলুন?

তোমাকে এরা কত দেয়?

বিশ হাজার।

মাসে বিশ হাজার পাও?

হাঁ।

কিন্তু তোমার যে রূপ তাতে বিশ হাজার কেনো পঞ্চাশ হাজার তোমার প্রাপ্য। শাম্মী আমি যদি তোমায় পঞ্চাশ হাজার দেই তাহলে......

আপনার ভালবাসার কাছে পঞ্চাশ হাজার কেনো এক লক্ষ টাকাও কিছুনা। সত্যি বলতে কি আজ পর্যন্ত যত ব্যক্তির সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে.......

শাম্মীর কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে বনহুর—আমার মত কেউ নয় এইতো?

হাঁ। আপনাকেই আমি প্রথম এক ধৈর্যশীল পুরুষ রূপে দেখেছি।

কেমন?

যার মধ্যে দেখিনি কোন লালসাপূর্ণ মনোভাব। নিজকে বিক্রি করে পয়সা উপার্জনই আমার পেশা। তাই এ হোটেলে আসার পর থেকে সবার মনোতুষ্টিই করে এসেছি। যার পাশে গিয়েছি কেউ আমাকে পরিত্রাণ দেয়নি। সবাই তাদের প্রাপ্য নিয়েছে আদায় করে। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এ হোটেল থেকে পালিয়ে নিজকে বাঁচাতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। নাগপাশের মতই জড়িয়ে পড়েছি এই হোটেলের সঙ্গে যেন আমিও এ হোটেলের একটি অঙ্গ। থামলো শাম্মী, তার মুখমন্ডলে একটা ব্যথা করুন ভাব জেগে উঠলো।

বনহুর ওর কপাল থেকে এলো মেলো চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে বললো—বিচিত্রময় পৃথিবীর বৈচিত্রময় মানুষ। এ পৃথিবী বড় স্বার্থপর তাই সবাই পাবার জন্য ব্যাকুল। এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি লোভ মোহ পরিহার করে চলতে পারবে সেই......পারে জয়ী হতে।

সত্যি মিঃ লিয়ন আপনি অস্বাভাবিক মানুষ। আমাকে সেদিন গভীর রাতে নিভৃত্বে পেয়েও আপনি আমাকে স্পর্শ করেননি। আপনার ঐ দুটি চোখে দেখতে পাইনি কোন কুৎসিত ইংগিৎ পূর্ণ চাহনী। আপনি মানুষ নন......

শাম্মী তুমি বড্ড ভাবময় হয়ে পড়েছো। আচ্ছা আজ এসো। তোমার জন্য প্রতিক্ষা করবো।

শাম্মী বেরিয়ে যায়।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে ড্রাইভার বেশী রহমান।

বনহুর দাঁড়িয়েছিলো এবার সে আসন গ্রহণ করে।

রহমান নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পূর্বে তার ক্যাবিন থেকে শাম্মী বেরিয়ে গেলো। রহমানের পাশ কেটেই গেছে সে, তাই রহমান একটু নিজকে বিব্রত বোধ করছিলো।

বনহুর সচ্ছ কণ্ঠে বললো—রহমান সেই তরুণী এসেছিলো।

দেখেছি সর্দার।

ওকে দিয়ে আমাদের কাজে অনেক সাহায্য হবে বলে আমার মনে হচ্ছে—তরুণীর নাম শাম্মী। হাঁ তুমি তখন বলে ছিলে কোয়েটা থেকে কায়েস যে সংবাদ পাঠিয়েছে......

রহমান একটা মানচিত্র বের করে মেলে ধরলো।

বনহুর এবার মনোযোগ সহকারে মানচিত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

❑

সাগাই দুর্গ।

ভূগর্ভে অন্ধকার ময় একটা বৃহৎ আকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের বাংলাদেশের যে সব বীরসন্তান পাকিস্তানে কোয়েটা, নোরাইল, পেশোয়ার, তুখারাম, লাহোর, করাচী প্রভৃতি গ্রেপ্তার করে এখানে আটক করা হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এই সব সামরিক কর্মচারীদের শুধু আটক করেই ক্ষান্ত হয়নি, এদের উপর চালানো হচ্ছে অকথ্য নির্মম অত্যাচার।

মাঝে মাঝে বন্দী কক্ষ থেকে বন্দীদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়, সন্ধ্যার পূর্বে যখন আবার এদের ফিরিয়ে আনা হয় তখন এরা মৃতের ন্যায় কাহিল হয়ে পড়ে। সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন। জামা কাপড় ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত।

একেই তো বন্দীরা ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর। সমস্ত দিন তাদের পেট পুরে কোনদিন খেতে দেওয়া হয়না। যা খেতে দেওয়া হয় তা যৎ সামান্য মাত্র। কোনদিন সচ্ছ পানিও পান করতে দেয়না ওদের গন্ধ যুক্ত পানি দেওয়া হয় তাও অতি অল্প।

সাগাই দুর্গে। সামরিক কর্মচারীগণকে আটক রেখে সাজা দেওয়া হচ্ছে। এখানে সাধারণ বাঙ্গালীদের রাখা হয়নি। তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন বন্দী শিবির।

জল্লাদ ইয়াহিয়ার মুখে চুন কালি মাখিয়ে তাকে গদি থেকে নামিয়ে শিয়ালের মত ধূর্ত লারাকানের নবাব জাদা ভুট্টো সাহেব গদিতে বসে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে চলেছেন। তার কর্মচারীদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাঙ্গালীদের উপর আমরা যাই করিনা কেনো অতি গোপনে করতে হবে, একথা যেন বাইরের রাষ্ট্র-টের না পায়।

নবাব জাদার সতর্কবাণী উপেক্ষা করার সাধ্য কার। তাই ইচ্ছা থাকলেও প্রকাশ্যে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ চালানো সম্ভব হচ্ছেনা। যতদূর গোপনতা রক্ষা করেই কাজ করে চলেছে পশ্চিমা মহাত্মনগণ।

সামরিক অফিসার ও কর্মচারীদের যে শাস্তি দেওয়া হয় তা কল্পনাতীত। প্রথমে তাদের কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অবশ্য সেটাই উপলক্ষ মাত্র, অত্যাচারের পূর্বে কিছু একটা সূত্র প্রয়োজন না হলে অযথা মারপিট করাটা কেমন যেন বেখাপ্পা দেখায়। প্রথমে চলে রোলার আঘাত, তারপর চলে অগ্নিদগ্ধ লৌহ শলাকা দ্বারা দেহের বিভিন্ন স্থানে সেক, তারপর ইলেকট্রিক চার্জ। নানাভাবে অত্যাচার চালানোর পর বন্দীদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় বন্দী শিবিরে।

সাগাই দুর্গ।

গভীর রাত।

সাগাই দূর্গের একটি নিভৃত কক্ষে সমস্ত সামরিক কর্মচারীদের জড়ো করা হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে তোমাদের আজ নতুন আর একটি ভাল শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে।

বন্দীগণ ভাবছে সত্যি বুঝি তাদের ভাল কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে একটু মুক্ত বাতাস পাবে। তাই তাদের মুখোভাব প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

দুর্গের অপর এক জায়গায় কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গোপনে আলাপ আলোচনা করছে। এক ব্যক্তি বললো—মোটরের দরজা বন্ধ থাকবে। যখন মোটর খানা রাভী নদী অতিক্রম করার জন্য ব্রিজের উপর উঠবে ব্যাস গাড়ির মধ্যে গ্যাস ছাড়বে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে সবাই। তারপর গাড়ি থেকে সবাইকে রাভী নদী বক্ষে নিক্ষেপ করবে।

বিরাট বপু ওয়ালা ড্রাইভার মাথা দোলালো, সে ঠিক্ বুঝতে পেরেছে।

ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে তার সহকারী।

এবার ড্রাইভার সহকারীকে লক্ষ্য করে বললো—কত জন বন্দী আছে?

সহকারী জবাব দিলো—প্রায় দু'শজন।

সবাই এরা সামরিক বাহিনীর লোক?

এবার জবাব দিলো প্রথম ব্যক্তি—হাঁ বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী।

ড্রাইভার বললো আবার—এক সঙ্গে সবাইকে তো নিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা মালিক?

কতজন তোমার বাড়িতে ধরবে? বললো সেই প্রথম ব্যক্তি। এই লোকটি এখানকার কর্মকর্তা বলে মনে হচ্ছে।

ড্রাইভার জবাব দিলো—পঞ্চাশ জন ধরবে।

আচ্ছা পঞ্চাশ জনকেই আজ সরিয়ে ফেলো তারপর কাল আবার পঞ্চাশ জনকে বুঝলে......

ড্রাইভার পান চিবুচ্ছিলো, এবার ঠোঁটের ফাঁকে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চিবুনো পানের অংশগুলো বের করে পুনরায় চিবুতে চিবুতে বলে—বুঝেছি মালিক।

তাহলে যাও কাজ শুরু করো। তাদের লোকদের লক্ষ্য করে বললো মালিক—যাও তোমরা বন্দীদের গাড়িতে তুলে দাও।

ড্রাইভার গাড়ির দিকে এগুলো।

সহকারী বললো—ওস্তাদ আমি কয়েকটা পান নিয়ে আসি।

পান লাগবেনা আমার কাছে প্রচুর পান আছে। তুমি এসো......

চলুন ওস্তাদ।

সহকারী ওস্তাদের পিছনে এগিয়ে চললো।

তখন গাড়িতে বাঙ্গালী কর্মচারীদের উঠানো হচ্ছে। গুণে গুণে পঞ্চাশ জনকে তুলে দেওয়া হলো। অন্ধকার রাত চারিদিকে থম থম করছে।

ড্রাইভার আর একখিলি পান মুখে গুঁজে গাড়িতে উঠে বসলো। সহকারীকে বললো—তুমি হুঁসিয়ার থাকবে রাঙ্গী নদীর নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই গ্যাস পাম্পের সুইস টিপে দেবে তারপর ব্রিজের উপর এসে......

থাক আর বলতে হবেনা আমি সব জেনে নিয়েছি ওস্তাদ।

ড্রাইভারের পাশের আসনে উঠে বসলো তার সহকারী নিজামী। গাড়িতে চড়ে বসবার পূর্বে গাড়ির দরজা ভালভাবে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়ে এলো সে।

গাড়ি এবার ছুটতে শুরু করলো।

জনহীন রাজ পথ।

মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। দোকানগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। লাইট পোষ্টগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোন হোটেল থেকে তখনও কাঁটা চামচের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গাড়িখানা জাহাঙ্গীর রোড ছেড়ে ফিরোজ পুর রোড ধরে রাঙী নদীর দিকে অগ্রসর হলো। অদূরে একটা মোড়ের দোকান থেকে হৈচৈ শোনা যাচ্ছে।

ড্রাইভার স্পীডে গাড়ি চাপিয়ে চলেছে।

সহকারী তার দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে হাই তুলে বললো—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ড্রাইভার ধমক দিয়ে উঠে—রেখে দাও তোমার ঘুম। সজাগ হয়ে বসো। আমরা প্রায় এসে গেছি মাত্র কয়েক মাইল দূরেই রাঙী নদীর হাব্সী ব্রিজ।

ও তাই নাকি, আমার কিন্তু খেয়াল নেই।

সব মনে আছে তো?

আছে ব্রিজের নিকটবর্তী হলেই গ্যাস পাইপের সুইচ টিপে দেবো। বাস সব খতম হয়ে যাবে তারপর......সব মনে আছে ওস্তাদ, সব মনে আছে।

আবার নীরব।

গাড়িখানা উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

এখন দু'পাশে কোন বাড়িঘর বা দালান কোঠা নাই। পথের দু'ধারে বিস্তৃত প্রান্তর। সো সো করে বাতাস বইছে। একটা রী-রী শব্দ হচ্ছে হাওয়ার মধ্যে।

রাঙী নদী অতি নিকটে এসে পড়েছে, তাই হাওয়া এতো ঠান্ডা।

গাড়ির ভিতরে বন্দীরা মাল বোঝাই বস্তার মত এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। ভিতরটা জমাট অন্ধকার তারপর গরমে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সবার। তবু একটা ক্ষীণ আশা হয়তো বা তাদের মধ্যে উকি দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা তারা একটু মুক্ত বাতাসের জন্য প্রতিক্ষা করছে। ওরা জানেনা তাদেরকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে অনেকেরই সন্দেহ জেগেছে হয়তোবা এ যাত্রাই তাদের জীবনে শেষ যাত্রা। কোনদিন হয়তো তারা আর আলোর মুখ দেখতে পাবেনা। যদিও মনে সন্দেহ জেগেছিলো তবু বিনা আপত্তিতে গাড়িতে উঠেছিলো, কারণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে তারা অনেক আগেই। এখানে থাকলেও মরতে হবে সেখানেও মরতে হবে। পশ্চিমা পশুরা তাদের মুক্তি দেবেনা। এরা যদি মুক্তি পায় তা হলে পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের অবস্থা

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই গাড়ির খোলসে যে সব সামরিক কর্মচারী বন্দী ছিলেন তারা নিরাশার অন্ধকারে হাবু ডুবু খাচ্ছিলেন।

এবার হাব্‌সী ব্রিজ দৃষ্টিগোচর হলো।

ব্রিজটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিট তাহলেই ব্রিজের উপর গাড়িখানা পৌঁছে যাবে।

গাড়ির স্পীড আরও বেড়ে গেছে।

ড্রাইভার বললো—নিজামী বিষাক্ত গ্যাস এর সুইচ টিপে দাও......

কথা শেষ হয়না, পাঁজরে একটা শক্ত ঠান্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করে ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গে নিজামীর কণ্ঠ স্বর, গাড়ি রুখো।

ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই বলে নিজামী—এই মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করবো তোমাকে। গাড়ি রুখো বলছি।

ড্রাইভার নিজামীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিলো, এবার সে গাড়ি রুখতে বাধ্য হয়। হাবসী ব্রিজের অনতি দূরে গাড়ি থেমে পড়ে।

নিজামী তখনও ড্রাইভারের বুকে রিভলভার চেপে ধরে রেখেছে, বললো—একচুল নড়লে গুলি ছুড়বো। গাড়ি থেকে নেমে পড়ো বাছাধন।

ড্রাইভার একটা কথা উচ্চারণ করবার সাহসী হলোনা। বাধ্য হলো সে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। নিজামী তখনও কিন্তু রিভলভার সরিয়ে নেয়নাই, বললো—এসো আমার সঙ্গে।

গাড়ির পিছনে এনে বললো নিজামী—শীঘ্র চাবি বের করে তালা খুলে ফেলো।

ড্রাইভার চাবি নিয়ে তালা খুলে দেয়, একটি কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়না। নিজামী যে আসল নিজামী নয় সে ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে। কথা বললেই যে ওর হাতের রিভলভার গর্জে উঠবে তাতে কোন ভুল নাই। তাই ড্রাইভার কোন রকম প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়না।

তালা খুলে দিতেই একটা ঠান্ডা মুক্ত বাতাস বন্ধ গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। বন্দীগণ গুদামজাত অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলো তারা নিশ্বাস নিলো।

বললো নিজামী—আপনারা নেমে আসুন গাড়ি থেকে।

বন্দীগণ হতভম্ব হয়ে গেছে, যদিও জায়গাটায় কোন আলো ছিলোনা তবু অদূরস্থ লাইট পোষ্টের আলোতে সব তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে ড্রাইভারের পিঠে তার সরকারী রিভলভার চেপে ধরে আছে।

ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় বুঝতে পারেন বন্দীগণ। তারা নেমে পড়ে গাড়ির খোলসের মধ্য থেকে।

এবার নিজামী ড্রাইভারকে বলে—যাও ভিতরে উঠে পড়ো।

ড্রাইভার বলে উঠলো—নিজামী তুমি বিশ্বাস ঘাতক......

কে নিজামী......আমি তোমার যমদূত......কথাটা বলে নিজামী তার দাড়ি গোঁফ খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার চমকে উঠলো।

বন্দী সামরিক অফিসারগণ দেখলো সুন্দর বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক। কেউ কোন কথা বলতে পারছেনা, সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে।

রিভলভারধারী ভদ্রলোক স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুর বজ্র কঠিন কণ্ঠে বললো—ড্রাইভার তুমি যে ভাবে এদের হত্যা করবে মনস্থ করেছিলে আমি তোমাকে সেই ভাবে হত্যা করবো। বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মরতে কেমন অনুভব করো।

বনহুর কঠিন হাতে ড্রাইভারের জামার কলার চেপে ধরে টেনে গাড়ির খোলের মধ্যে তুলে দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর ড্রাইভ আসনে বসে গ্যাস পাইপের সুইচ টিপে ধরলো। পরক্ষণেই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। একটু বিলম্ব করে খুলে ফেললো গাড়ির দরজা তারপর টেনে বের করে আনলো ড্রাইভারের প্রাণহীন দেহটা। ফেলেদিলো রাঙী নদীর বুকে।

বাঙ্গালী বন্দী অফিসারগণ অবাক হয়ে বনহুরের কার্য কলাপ দেখছে তারা ভেবে পাচ্ছেনা কি ঘটলো বা কি ঘটছে। ড্রাইভারের মৃতদেহটা রাঙী নদীতে নিক্ষেপ করার পর পুনরায় বনহুর ফিরে এলো সামরিক অফিসারদের সম্মুখে, ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বললো সে তাদের কাছে।

সবশুনে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো সামরিক অফিসারদের মন!

বনহুর কিন্তু তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর সময় না দিয়েই বললো—আপনাদের জন্য আমি কয়েক খানা জেলে নৌকার বন্দোবস্ত করেছি। আপনারা সেই নৌকার মাঝি সেজে পাকিস্তান থেকে সড়ে পড়ুন। সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে আপনারাই সেই সামরিক কর্মচারী বা অফিসার। আপনাদের আরও অনেকে এখনও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির বন্দী শিবিরে আটক আছে তাদের মুক্তির জন্য আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো। চলুন আমার সঙ্গে......

বনহুর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে রাঙী নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো। আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ যে নৌকাগুলো দেখছেন ও গুলো আপনাদের জন্য......হাতে তালি দেয় বনহুর একবার দু'বার তিন বার।

অল্পক্ষণেই দু'জন লোক এসে দাঁড়ায়।

বনহুর বললেন—কায়েস, এদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আরও বহু বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী এখনও সাগাই দূর্গে আটক আছে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। তোমরা এদের জন্য জেলেদের পোশাক এনেছো?

এবার জবাব দিল কাওসার—হাঁ আপনার কথা মতই আমরা জেলে নৌকায় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছি।

খাবার নিয়েছো?

হাঁ প্রচুর চিড়া এবং গুড় সংগ্রহ করে নিয়েছি।

বনহুর ফিরে তাকালো অন্ধকারে সামরিক অফিসারদের দিকে তারপর বললো—বন্ধু এবং আমার ভাইরা এবার আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন। খোদা আপনাদের সহায়......

সামরিক অফিসারগণ বনহুরকে এক এক করে আলিঙ্গন করলো, সবার চোখেই পানি। বললো ওরা—জানিনা কে আপনি? এ বিপদ মুহূর্তে আপনার অসীম দয়া আমাদের জীবন রক্ষা করলো......

কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের কথা বলার বা শোনার সময় ছিলোনা। সবাইকে জেলে নৌকায় উঠার জন্য বলে বনহুর। বনহুরের আদেশে সবাই অগ্রসর হয়।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে চলেছে।

বনহুর তাকে জেলে নৌকায় যাবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু বৃদ্ধা ভদ্রলোক যাবেন না বলে জেদ ধরলেন।

বনহুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে আপনার বলুন?

বৃদ্ধ কেঁদে কেঁদে বললো—আমার সবই গেছে আমি বেঁচে থেকে কি হবে। পশ্চিমারা আমার দু'ছেলেকে মেরে ফেলেছে, আমার স্ত্রীকে ওরা হত্যা করেছে। আমার একমাত্র মেয়ে নাসিমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। জানিনা নাসিমা মা আমার কোথায়। কেমন আছে সে......

বনহুর বৃদ্ধের কথায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করলো কিন্তু সময় আর বেশি নেই, রাতের অন্ধকারেই তাদের নৌকা রাঙী নদী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

কায়েস কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়—বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের নৌকা ছাড়তে হবে।

বৃদ্ধ তখনও বেকে বসে আছে, তিনি উন্মাদের মত বলছেন—মা নাসিমাকে ছেড়ে আমি পালিয়ে যেতে পারবোনা। আমাকে এখানে থাকতে দাও......না না যাবোনা আমি যাবোনা......

বনহুর কি করবে ভেবে পায়না, বৃদ্ধের করুন কথা গুলো তার হৃদপিন্ড ছিড়ে ফেলছিলো। বললো—আমি কথা দিছি আপনার মেয়ে নাসিমাকে আমি খুঁজে বের করবো। সত্যি সত্যি বলছো বাবা? বৃদ্ধের কণ্ঠে ব্যাকুল উচ্ছসিত ভাব।

বনহুর চুপ করে থাকতে পারেনা, সে পুনরায় বলে—সত্যি! বলছি।

আমাকে স্পর্শ করে বলো আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে......

হাঁ আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো। আপনি যান বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছি—যাচ্ছি......পারবে জানিঃ তুমি পারবে মা-মা নাসিমাকে উদ্ধার করতে......কায়েস ততক্ষণে বৃদ্ধের হাত ধরে এক রকম প্রায় টেনে নিয়ে চলে যায়।

সবগুলি অফিসার ততক্ষণে নৌকায় উঠে বসে ভীত কম্পিত হস্তে পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। পেটে ক্ষুধা, দেহে পশ্চিমাদের নির্যাতনের নির্মম আঘাতের চিহ্ন। তবু বাঁচার আশায় সবাই যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

কায়েস আর কাওসার এদের নিয়ে নৌকায় চেপে বসেছে। অল্পক্ষণেই নৌকাগুলো তীর ত্যাগ করে গভীর পানির দিকে ভেসে চললো।

বনহুর কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো নৌকাগুলোর দিকে। ঝাপসা অস্পষ্ট লাগছে নৌকাগুলো। বারবার বনহুরের কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, আমাকে স্পর্শ করে বলো আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে......

কিন্তু কোথায় সেই নাসিমা যাকে পশ্চিমারা ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে, কেমন করে তাকে সে খুঁজে বের করবে। কে বা কারা তাকে নিয়ে গেছে তাই বা কেমন করে জানবে।

বনহুর বিষণ্ন মনে ফিরে আসে, একটু পূর্বে বন্দীদের মুক্ত করতে পেরে তার যে আনন্দ হয়েছিলো সে আনন্দ যেন নিমিশে মুছে যায়। দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়ায় বনহুর গাড়ির পাশে।

গাড়ির ড্রাইভিং আসনে উঠে বসতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে একটা আর্তচিৎকার। কোনো মা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে চলেছেন—কে আছো, আমার বাছাকে বাঁচাও......আমার বাছাকে বাঁচাও......

বনহুর কান পেতে শুনলো কোন্দিক থেকে শব্দটা আসছে। বুঝতে পারলো ঠিক নদীর তীরের দিক থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো। যদিও পথের লাইট পোষ্টের আলোতে তেমন বেশিদূর দেখা যাচ্ছিলো না তবু বনহুর দ্রুত ব্রিজের নিচে নদী তীরের দিকে এগিয়ে চললো। থেমে থেমে সেই কাতর চিৎকার ভেসে আসছে, কোনো বৃদ্ধার গলা ভাঙ্গা করুণকণ্ঠস্বর।

বনহুর ব্রিজের নিচে এসে পড়তেই দেখলো দু'জন লোক একটি লোককে মাটিতে শুইয়ে জবাই করতে যাচ্ছে। তাদের হাতের ছোরাখানা অন্ধকারে চক্চক্ করে উঠলো।

একটি মহিলাকে ধরে আছে একজন লোক। সেই বৃদ্ধা মহিলাই চিৎকার করে চলেছেন—বাঁচাও, আমার বাছাকে বাঁচাও......কে কোথায় আছো, আমার বাছাকে বাঁচাও......

বনহুর একবার থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নেয়, তারপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে লোক দুটিকে, যারা ছোরা নিয়ে একজনকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর ওদের পিছন থেকে জামার কাঁধের অংশ ধরে টেনে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঘুষি লাগিয়ে দেয় নাকের উপর।

ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায় একজন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোরা হাতে রুখে দাঁড়ায় আক্রমণ করে সে বনহুরকে।

বনহুর প্রথম ব্যক্তিকে ধরাশয়ী করে দ্বিতীয় ব্যক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ওর ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে প্যাঁচ মেরে ফেলে দেয় ওকে মাটিতে।

ততক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূ'শয্যা ত্যাগ করে পুনরায় আক্রমণ চালায়।

বনহুর ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীগর্ভে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খেতে থাকে লোকটা। এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোরাসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের উপর।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লোকটাকে ধরে ফেলে, তারপর ওর হাতখানা মোচড় দিয়ে ছোরাটা কেড়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে বসিয়ে দেয় সজোরে।

নিস্তব্ধ নদীতীরে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে উঠে। লোকটা পেট চেপে ধরে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। লোক দু'জন অবাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার বনহুর হাতের ধুলো ঝেড়ে সরে আসে যে লোকটিকে ওরা দু'জন হত্যা করার জন্য চেষ্টা নিয়েছিলো তার পাশে। বৃদ্ধাও তার সন্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এতোক্ষণ তারা অবাক হয়ে দেখছিলো—কে এই মহান ব্যক্তি যে এসে পড়ায় তারা রক্ষা পেলো!

বনহুর এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা কে এবং কি করে এই শয়তানদের কবলে পড়েছেন?

বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে বলতে গেলেন কিন্তু মাকে চুপ থাকতে বলে সন্তান বলতে লাগলো—আমরা বাংলাদেশের মানুষ। বাঙ্গালী আমরা, তাই আমাদের উপর পশ্চিমারা নানারকম নির্যাতন চালিয়ে চলেছে। আমার মা ও আমি নৌকাযোগে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শয়তান পশ্চিমারা টের পায় এবং আমরা নৌকায় উঠবার আগেই আমাদের ধরে ফেলে। আমাকে ওরা ছোরা দিয়ে জবাই করতে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে আপনি......

আপনি কি পাকিস্তানে চাকরি করতেন?

হাঁ, পি আই এতে কাজ করতাম। আমি একজন পাইলট।

ও।

আমাদের প্রায় সাতশ পাইলটকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী আটক করেছে। আমি কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম হয়েছি।

এবার বৃদ্ধা বলে উঠেন—বাবা, তুমি কে জানি না, কিন্তু তুমি আমার আর এক সন্তান। তুমি আমার ছেলের প্রাণরক্ষা করলে। দোয়া করি আল্লা তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার স্নেহময়ী জননীর মুখখানা। বলে উঠলো বনহুর—মা, আপনার দোয়া আমার জীবনের পাথেয়। আচ্ছা ভাই, আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন?

আর কিছু করতে হবে না, ঐ যে নৌকা দেখছেন ওটা আমাদের নৌকা। মাঝি দু'জন কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, এবার তারা এসে পড়বে তাহলে আমরা পালাতে সক্ষম হবো।

বেশ, তাই করুন। আপনার নৌকায় গিয়ে বসুন। মাঝিরা এসে পড়লে নৌকা ছাড়বেন। চলি......

নির্বাক নয়নে মা ও সন্তান তাকিয়ে রইলো।

বনহুর অন্ধকারে মিশে গেলো, আর ওকে দেখতে পেলো না তারা।

❑

বনহুর তার ক্যাবিনে শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ধূমপান করে চলেছে। রাশি রাশি ধুঁয়ো কক্ষমধ্যে ঘুরপাক খেয়ে একসময় মিশে যাচ্ছে। বনহুরের মনেও তেমনি কোন রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো, আবার মিশে যাচ্ছিলো মনের আকাশে। সব চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে বার বার সেই কথাটা মনের গহনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো, সেই বৃদ্ধ সামরিক অফিসারের শেষ কথা......আমাকে স্পর্শ করে বলো, আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে......নিজের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে বনহুরের কানে......হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো......হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো......

কিন্তু কোথায়—কোথায় তাকে খুঁজবো আমি। কেন, কেন তাঁকে স্পর্শ করে শপথ করেছিলাম? তখন এমন করে তলিয়ে ভাবিনি—খেয়ালের বশে বলেছিলাম......হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি তাকে খুঁজে বের করবো......এও কি সম্ভব...এতোবড় এই পাকিস্তানের কোথায় রয়েছে সেই নাসিমা......

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর—সর্দার!

চমকে উঠে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে—কে, রহমান?

হাঁ সর্দার।

কি সংবাদ?

কায়েস আর কাওসার ফিরে এসেছে।

অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো বনহুর, সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে রহমানের মুখের দিকে—কায়েস আর কাওসার ফিরে এসেছে?

হাঁ সর্দার।

নৌকাগুলো তাহলে ঠিকভাবে নিরাপদেই পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো?

হাঁ, নিরাপদেই নৌকাগুলো পেরিয়ে গিয়েছিলো।

যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। এতোগুলো বাঙ্গালীকে এক সঙ্গে পাঠিয়ে আমি বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। নৌকাগুলো ফিরে এসেছে আবার?

হাঁ সর্দার, সবগুলো নৌকা ফিরে এসেছে।

মাঝিদের প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছো?

দিয়েছি।

বেশ করেছো। একটু ভেবে পুনরায় বললো বনহুর—রহমান, সাগাই দূর্গে এখনও বহু বাঙ্গালী সামরিক অফিসার আটক আছেন। তাঁদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা কল্পনাতীত। ভাবছি কি করে এঁদের উদ্ধার করা যায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো আবার বনহুর—বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের নিয়ে অত্যন্ত ভাবছেন। কিভাবে এদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এ নিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টাও চালাচ্ছেন। কিন্তু কবে যে পাকিস্তানী বাঙ্গালীরা তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন, কবে যে তাঁরা এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ততদিনে পাকিস্তানী পশ্চিমা নরপশুরা কত বাঙ্গালীকে যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে বলা যায় না।

সে কথা মিথ্যা নয় সর্দার। রামসিং শিয়ালকোট থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে সেখানে কয়েকটি বন্দীশিবিরে বাঙ্গালী নারী-পুরুষদের আটক রেখে তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকে হত্যাও করা হচ্ছে।

রহমান, বাংলাদেশে থাকাকালেই আমি তোমাদের সবাইকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা বিদেশ হয়ে পাকিস্তানে এসে কাজ শুরু করেছো। তোমাদের সহায়তা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছে। নাহলে আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না। তোমাদের আরও বেশি পরিশ্রম

করতে হবে। রহমান, আজই আমি শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। রামসিংকে জানিয়ে দাও সে যেন প্রস্তুত থাকে।

আচ্ছা সর্দার।

আর কোনো সংবাদ আছে?

আজ নতুন আর কোনো সংবাদ নেই।

রহমান!

বলুন সর্দার?

কান্দাই থেকে বেশ কিছুদিন হলো এসেছি। কান্দাই-এর সংবাদ জানার জন্য আমি উন্মুখ আছি। না জানি সেখানে কে কেমন আছে। আহসান কোথায় আছে এবং সে কি কাজ করছে?

আহসান এখন সিন্ধু এলাকায় কাজ করছে।

তাহলে হারুনকে ডেকে পাঠাও। সে হায়দারাবাদে আছে—তাকে বোম্বে হয়ে কান্দাই যেতে বলো এবং নিজে গিয়ে সর্বসংবাদ নিয়ে আসবে। বিশেষ করে মা কেমন আছেন, তিনি বুড়ো হয়েছেন, কাজেই তাঁর জন্য মনটা বড় অস্থির লাগে সময় সময়। কখন কি হয় তা কে জানে! রহমান, বড় হতভাগ্য সন্তান আমি, তাঁর কোনো সেবা যত্ন করতে পারলাম না......

রহমান বললো—সর্দার, আপনি দেশ ও দশের কাজের মধ্য দিয়েই তো মায়ের সেবা করে যাচ্ছেন।

তাতে মন শান্তি পায় না রহমান। মা বলেছিলেন, তুই সংসারী হয়ে আমার পাশে থাকবি, আমি বড় শান্তি পাবো কিন্তু তাঁকে শান্তি দিতে পারিনি, কাজেই আমিও শান্তি পাবো না এতে আর আশ্চর্য কি আছে। যাক্, তুমি হারুনকে কান্দাই পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

আর শোন, আজই আমি শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে চাই। ওয়্যারলেসে রামসিংকে সংবাদটা জানিয়ে দিও।

আচ্ছা সর্দার জানিয়ে দেবো।

এখন যাও তাহলে।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

রহমানের শরীরে ড্রাইভারের ড্রেস। এ হোটেলে তাকে সবাই মিঃ লিয়নের ড্রাইভার বলেই জানে।

বনহুর আবার শয্যায় গা এলিয়ে দেয়। নতুন একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে। আবার ডুবে যায় সে চিন্তা সাগরে। কয়েকদিন আগের সেই বৃদ্ধার কথাগুলো কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়,......বাবা তুমি আমার

সন্তানকে রক্ষা করলে, খোদা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন......সত্যি কি তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে? পাকিস্তানের বন্দী বাঙ্গালীদের উদ্ধার করতে সক্ষম হবে সে? এখন তার মনে তো অন্য কোনো কামনা নেই, শুধু বাঙ্গালী অসহায় বেচারীদের উদ্ধার চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। বাংলাদেশ সরকার যথাসাধ্য; চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু এদিকে এরা নরপিশাচের দল ততদিনে বাঙ্গালীদের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে তাতে বাঙ্গালীদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অসহনীয়। এক একটা মুহূর্ত বাঙ্গালীদের কাটছে এক একটা যুগের মত।

হঠাৎ একটা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—আসতে পারি কি?

এসো—এসো......বনহুর বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে শাম্মী। অপূর্ব দেহ ভঙ্গীমায় এসে দাঁড়ায় সে, মিষ্টকণ্ঠে বলে—কেমন আছেন মিঃ রিয়ন?

বনহুর ছোট্ট করে জবাব দেয়—ভালো।

হাসে শাম্মী—কই, আমি কেমন আছি তাতো জিজ্ঞাসা করলেন না?

তুমি যে ভাল আছো দেখতেই পাচ্ছি।

বসতে পারি কি?

বসো শাম্মী। একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় বনহুর।

ওখানে নয়, আপনার পাশে বসবো যদি অনুমতি দেন।

বসো—বসো। যদি সুখী হও আমার পাশে বসো।

আপনি তো কোনোদিন ডাকবেন না, তাই আমি নিজে গায়ে পড়ে আসি। বিশ্বাস করুন, এ হোটেলে বহু ধনকুবের আছে যারা আমাকে পাশে পাবার জন্য প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করছে।

জানি, তাছাড়া আমি তো আর ধনকুবের নই শাম্মী ।

আমি তো বলছি—আপনার ভালবাসা পেলে আমি লাখ টাকাও উপেক্ষা করতে পারি।

সত্যি শাম্মী, আমি নিজকে ভাগ্যবান মনে করছি।

সব সময় আপনার হেঁয়ালি পূর্ণ কথা।

তার মানে?

মানে আপনার কথাগুলো......

বড্ড নীরস, এই তো?

মোটেই না। যাক ওসব কথা, জানেন আজ আমি কেন এসেছি?

বলেছি তো আমার সৌভাগ্য।

হাঁ, সৌভাগ্যই বটে। শাম্মী ভ্যানিটিব্যাগ খুলে একটা গোলাপী রঙের কার্ড বের করে বনহুরের হাতে দিলো।

বনহুর কার্ডখানার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললো —হোটেলের তেরো তলার এক নম্বর ক্যাবিনে আজ পার্টি আছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি নাচবে শাম্মী......

হাঁ।

তুমি নাচতেও জানো, সত্যি আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

আপনি পার্টিতে যোগ দিলে আমার নাচ সার্থক হবে।

বেশ, যাবো।

এখন তাহলে চলি?

এতো শীঘ্র চলে যাবে শাম্মী?

এই হোটেলে সবাইকে কার্ড বিলি করার দায়িত্ব আমার উপরেই পড়েছে।

আচ্ছা এসো।

শাম্মী হাত তুলে বললো—বাই-বাই—

বনহুর পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। আজ তাহলে শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাচ্ছে না। তাকে এ পার্টিতে থাকতেই হবে। বনহুর তার হাতঘড়িটার পিছনে ছোট চাবিটায় চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির ঢাকনা খুলে গেলো। বনহুর চাপাস্বরে বললো—রহমান, আজ শিয়ালকোট রওয়ানা দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু হবে না, তুমি রামসিংকে সংবাদ দিয়ে দাও কবে যাবো পরে জানাবো......

ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে এক ভদ্রলোক।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে জামাটা টেনে হাতের উপর ঘড়িটা ঢেকে ফেলে। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয় বনহুর। তবু মুখে প্রসন্নতা টেনে বলে—আপনি......

লোকটা হাসলো, কেমন যেন ক্রুর হাসি বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। লোকটা যে পশ্চিম পাকিস্তানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটা উর্দূতে বললো—আপনি দেখছি সুন্দর বাংলা বলতে পারেন?

বনহুর এ হোটেলে বিদেশী বেশে উঠেছে। সে সব সময় উর্দূ এবং ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তা বলে। পোশাক পরিচ্ছদেও তার বিদেশীভাব রয়েছে। সে যে বাংলায় কথা বলে, এটা এ হোটেলের কেউ জানে না।

বনহুর লোকটার কথায় একটু হেসে বললো—আমি সব ভাষাই জানি কিনা, তাই......

ও বেশ বেশ!

বসুন।

হাঁ, বসবো বলেই এসেছি। আমি আপনার ঠিক পাশের রুমেই আছি। একা একা ভালো লাগে না তাই এলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে।

খুব খুশি হলাম।

লোকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

বনহুর তার চুরুটের টিনটা খুলে ধরলো—নিন।

লোকটা সচ্ছন্দে টিন থেকে একটা চুরুট তুলে নিলো। বনহুর নিজের চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে লোকটার চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলো।

বললো লোকটা—ক'দিন আপনাকে দেখিনি, কোথায় গিয়েছিলেন?

ছোট্ট জবাব দেয় বনহুর—কাজে।

কাজ! কি কাজ করেন আপনি? যদিও প্রশ্নটা করা আমার উচিত নয় তবু জানার বাসনা জাগছে।

বনহুর একমুখ ধুঁয়ো সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—ব্যবসা করি।

ও—একটা শব্দ করলো লোকটা। তার মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো, চুরুটে খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বললো—আমি এসে পড়ায় আপনি কি বিরক্ত বোধ করছেন?

মোটেই না।

তাহলে মাঝে মাঝে আসবো।

খুশি হবো।

আচ্ছা, এবার বলুন তো আপনার নামটা কি?

দরজায় আমার নেমপ্লেটে নজর ফেললেই দেখতে পাবেন।

মাফ করবেন বড্ড ভুল হয়েছে। আমি কিন্তু আপনার নামটা দেখেছি কিন্তু খেয়াল নেই......

লিয়ন আমার নাম।

তাহলে আমার নামটা বলি?

না বললেও ক্ষতি নেই, এক সময় কষ্ট করে গিয়ে আপনার নেম প্লেটখানা দেখে আসবো।

আপনি কিন্তু সুন্দর ইংরেজি বলতে পারেন।

বনহুর হাসলো।

তাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হচ্ছিলো।

লোকটা এবার উঠে দাঁড়ালো—আপনি পার্টিতে আসছেন তো?

বনহুর বললো—হাঁ, সেখানেই দেখা হবে আবার।

বেরিয়ে গেলো লোকটা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো। আপন মনেই বলে নিলো, তেরোতলার এক নম্বর ক্যাবিনে পার্টি আছে......নাচবে শাম্মী, যাবে সে সেখানে।

পায়চারী করছে বনহুর।

কোনো এক ক্যাবিন থেকে পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে।

হাতঘড়িটা দেখলো, এখনও সময় আছে কয়েক ঘন্টা। পুনরায় বসলো বনহুর শয্যায়, একখানা পত্রিকা সে তুলে নিলো হাতে। পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখলেও মন তার ছিলো গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কয়েক মিনিট পর পুনরায় পত্রিকা রেখে উঠে পড়লো বনহুর, স্যুটকেস খুলে বের করলো একটা ফটো। ফটোখানা আলোর সামনে মেলে ধরে ভালোভাবে দেখলো। একটা বৃদ্ধের ছবি। এবার বনহুর ফটোখানা হাতে নিয়ে প্রবেশ করলো বাথরুমে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না এ সেই মিঃ লিয়ন। ফটোখানার সঙ্গে নিজের চেহারা মিলিয়ে দেখে নিলো বনহুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

এবার বনহুর একটা ছড়ি হাতে দরজার দিকে পা বাড়ালো। মাজাটা একটু বাঁকা, মাথায় টুপি। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে সোজা লিফটের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

লিফটে চেপে এগারো তলার বোতামে চাপ দিতেই লিফটে সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, এগারো তলায় পৌঁছে গেলো বনহুর।

লিফট এসে থামলো এগোরো তলায়।

বনহুর তার পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নেমে পড়লো লিফ্‌ট থেকে। এবার সে এগিয়ে চললো সাত নম্বর ক্যাবিনের দিকে।

পথে একজন লোক তাকে দেখেই সালাম জানিয়ে বললো—ওস্তাদ, আপনি এসে গেছেন?

হাঁ, চলো।

চলুন ওস্তাদ।

লোকটার পিছু পিছু বৃদ্ধবেশী বনহুর সাত নম্বর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের মধ্যস্থ সবাই উঠে দাঁড়ালো, একসঙ্গে সবাই উচ্চারণ করলো, আচ্ছালামো আলাইকোম।

বৃদ্ধবেশী বনহুর উচ্চারণ করলো—ওয়ালেকুম ছালাম......

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু একজন উঠে দাঁড়ায়নি। লোকটা বসেই আছে, চেহারাটা যেন একটা জমকালো মহিষ। বিরাট দেহটার উপর ছোট্ট ফুটবলের মত একটা মাথা। বিড়ালের চোখের মত দুটো ক্ষুদে চোখ। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা বলে উঠে—ওমন করে চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আজ যেন প্রথম আমাকে দেখছেন।

হঠাৎ বনহুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত নিজকে সামলে নেয়, হেসে বলে উঠে—আপনাকে বড্ড রোগা লাগছে তাই......

ও! আমার শরীরটা ইদানীং বড় খারাপ হয়ে গেছে সিরাজ মিয়া। বসুন অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সিরাজ মিয়া এবার আসন গ্রহণ করলো।

অন্যান্য যে কয়েকজন লোক ক্যাবিনটার মধ্যে ছিলো তারাও বসে পড়লো।

একটা লোক বলে উঠলো—মালিক, চা আনবো না কি?

শরাব নিয়ে এসো। বললো মহিষ চেহারা লোকটা।

অনুচরটি বললো—পার্টিতে শরাব চলবে, এখন শরাব খেলে পার্টিতে যোগ দিতে পারবেন না মালিক।

বললাম পারবো, নিয়ে এসো।

আচ্ছা মালিক।

লোকটা বেরিয়ে গেলো।

এবার মহিষ আকার লোকটা সিরাজ মিয়াকে লক্ষ্য করে বললো—আলী জাফরীর কোনো সংবাদ পেয়েছেন মিয়া সাহেব?

সিরাজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আলী জাফরীর সংবাদ তো দূরের কথা, জাহাজখানা গাদান বন্দরে পৌছালো কি না তাও জানতে পারিনি।

আমি গাদানে সংবাদ নিয়ে জেনেছি মিয়া সাহেব। আজ পর্যন্ত জাহাজ 'শাহানাশাহ' গাদান বন্দরে পৌছায়নি। আলী জাফরীর সঙ্গে ছিলো ইয়াসিন, আবদুল্লা, ইয়াকুব আর চিশতী। এদের কারো কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বড় চিন্তার কথা। সিরাজী মিয়া, এ জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম।

হাঁ, সব শুনলাম এখন কি করা যায় ভাবছি।

ভেবে কি হবে, ঠিক আলী জাফরী মাল নিয়ে কোথাও ভেগেছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। বেটা ভিতরে ভিতরে নতুন কোনো ফন্দি এঁটেছিলো।

দেখা যাক্ কবে আলী জাফরী ফেরে। ও পালাবে কোথায়? বৌ-বাচ্চা সব তো হায়দারাবাদেই রয়েছে। সোলেমান?

বলুন মালিক? সোলেমান জবাব দিলো।

তুমি আলী জাফরীর বাড়িতে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেবে। তারা যেন গোপনে সন্ধান রাখে কবে কখন আলী জাফরী বাড়িতে আসে বা যায়। মহিষ আকার লোকটা কথাগুলো বলে থামলো।

এবার সিরাজী মিয়া বললো—নতুন কোনো জাহাজ এখন ......কথা শেষ না করে থেমে পড়লো সে।

মহিষ চেহারা লোকটা বললো—'শাহানশাহ' ফিরে না এলে অসুবিধা হবে। প্রকাশ্য খোলা জাহাজে তো আর বন্দীদের পাঠানো যায় না। তবে কয়েকদিন পর জাহাজ 'ফিরোজ খাঁ' শুকনো মাছ নিয়ে গাদান যাবে, তখন ঐ জাহাজে কিছু বাঙ্গালী বন্দী পাঠানো হবে। আপনি কতগুলো বন্দী জোগাড় করেছেন সিরাজ মিয়া?

মাথা চুলকে বললো সিরাজ মিয়া—আমার বন্দীশিবিরে বেশি নেই, শুনেছি সাগাই দূর্গে বহু মাল আছে।

মালিকের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—আপনি কিছু খোঁজ রাখেন না সিরাজ মিয়া, সাগাই দূর্গে যে সব বাঙ্গালী আদমীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তারা কোনোদিন মুক্তি পাবে না। এদের সবাইকে খতম করতে হবে। কারণ এরা সব বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী। আমাদের সরকার বলেছেন বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর একটি লোকও যেন রেহাই না পায়।

ঠিক বলেছেন মালিক সাহেব। এরা বাইরে গেলে পাকিস্তানের বিপদ ঘটবে। শেষ পর্যন্ত নিয়াজী আর ফরমান আলীর মত আমাদের সদাশয় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাহেবের গলায় দড়ি পড়তে পারে।

সিরাজী, আপনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন। কার সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলছেন......

বুড়ো হয়ে গেছি তো, তাই হঠাৎ বেখেয়াল হয়ে পড়ি। সিরাজ মিয়া কথার ফাঁকে একটা ছোট্ট টেপ্ রেকর্ড বাক্স সোফার নিচে লুকিয়ে রেখে দিলো।

বললো আবার সিরাজ মিয়া—জাহাজ 'ফিরোজ খাঁ' শুকনো মাছ নিয়ে কবে গাদান অভিমুখে রওয়ানা দেবে আমাকে জানাবেন?

হাঁ জানাবো, আপনি কিছু মাল দেবার চেষ্টা করবেন?

নিশ্চয়ই করবো, নিশ্চয়ই করবো......এখন তাহলে আসি। আমার টাকাটা নিতেই এসেছি গুলবাগে......

ততক্ষণে বয় শরাবপাত্র এবং কিছু খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো।

মালিক বললো—কিছু পান করে যান সিরাজী সাহেব।

না আজ নয়। জরুরি একটা কাজে আমাকে উঠতে হচ্ছে।

মালিক সাহেব কয়েক বান্ডিল টাকা সিরাজীর হাতে দিয়ে বলে—আজ পঞ্চাশ হাজার দিলাম, নিয়ে যান......

বাকিটা কবে দেবেন মালিক সাহেব?

কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন।

আচ্ছা, টাকার বান্ডিলগুলো পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায়—চলি তাহলে?

আসুন। বললো মালিক সাহেব।

বেরিয়ে গেলো সিরাজী মিয়া।

পথেই দেখা হয় আসল সিরাজী মিয়ার সঙ্গে। প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি একটা দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেলে বনহুর।

সিরাজী মিয়া সাত নম্বর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই ক্যাবিনস্থ সবাই তাকায়—ব্যাপার কি, উনি আবার ফিরে এলেন কেন।

মালিক সাহেব বলে উঠলো—সিরাজী মিয়া ফিরে এলেন কেন?

সিরাজী আসন গ্রনণ করে বললো—কি বললেন?

হঠাৎ কি মনে করে আবার এলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সিরাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মালিক সাহেবের মুখের দিকে। তারপর বললো—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি এসেছি আমার পাওনা টাকা নিতে।

মালিক সাহেব বলে উঠে—টাকা! কিসের টাকা? এই মাত্র তো টাকা নিয়ে গেলেন......

আমি টাকা নিয়ে গেলাম, বলেন কি!

হাঁ—এরা সবাই জানে, সবাই দেখেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখুন ।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠে—হাঁ, আপনি এইমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন।

মিথ্যে কথা। আমি এইমাত্র এলাম......

না, আপনি এসেছিলেন। বললো মালিক সাহেব।

না না, আমি আসিনি এবং টাকাও নেই নি।

মালিক সাহেব বলে উঠলো—সিরাজী মিয়া, আপনি মনে করেছেন আমাদের ধাপ্পাবাজি দিয়ে আবার টাকা আদায় করে নেবেন। পুলিশ—পুলিশ ডাকো!

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়লো, সব শুনে সিরাজী মিয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো।

কথাটা অল্পক্ষণে সমস্ত হোটেলে ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর তার নিজের ক্যাবিনে বসে হাসলো।

অল্পক্ষণ পরে হারুন প্রবেশ করলো বয়ের বেশে, হাতে তার ছোট্ট টেপ্ রেকর্ড। যে টেপ্ রেকর্ডখানা কিছুক্ষণ আগে সে সাত নম্বর ক্যাবিনের একটি সোফার নিচে রেখে এসেছিলো।

হারুন টেপ্ রেকর্ডখানা বনহুরের সম্মুখে রেখে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো— সিরাজী মিয়াকে পুলিশ এরেষ্ট করেছে।

বনহুর বললো—যেমন কর্ম তেমনি ফল। সিরাজীর বন্দী শিবিরে কতকগুলো বাঙ্গালী বন্দী আছে?

প্রায় দু'শ' এখন আছে। আর দু'শ' বাঙ্গালী বন্দীকে সে গোপনে চালান করেছে। মালিক সাহেবের কাছে প্রায় দেশড়' বাঙ্গালী তরুণী বিক্রি করেছিলো......

উপযুক্ত সাজা দিতে হবে বুড়োকে।

এবার বনহুর টেপ্ রেকর্ড অতি মৃদুস্বরে চালু করে শুনতে থাকে। সব শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

হারুন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। একটু পরে বলে উঠে—সর্দার, পার্টিতে যাবার সময় হয়ে গেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর। ও তাইতো......টেপ্ রেকর্ড বন্ধ করে উঠে পড়ে এবার।

অল্পক্ষণ পর তৈরি হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে কেউ তাকে চেনে না বা জানে না। তাকে আত্মগোপন করে বা ছদ্মবেশে ও থাকতে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ বিদেশী পোশাকে সজ্জিত হয়েছে বনহুর। এই পোশাকে তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

পার্টিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো গুলবাগ হোটেলের ম্যানেজার রিজভী সাহেব। তিনি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ লিয়নের। প্রত্যেকটা ক্যাবিন থেকে অতিথিরা এসেছেন। এরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোক।

হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো সেই মহিষ আকার লোকটার উপর। এক পাশে তার বিরাট বপু নিয়ে মুখটা গম্ভীর করে বসে আছে।

রিজভী সাহেব বললেন—উনি আমাদের হোটেল গুলবাগের একজন অংশীদার। ওনার নাম মালিক নাদিরশাহ।

বনহুর হাত তুলে সালাম জানালো।

মালিক সাহেব সালামের উত্তর দিলো।

রিজভী সাহেব ললেন—বড় আফসোস, আজ এই আনন্দময় দিনে মালিক সাহেবের মন মোটেই ভালো নয়। আপনারা সবাই শুনে দুঃখিত হবেন । মিঃ সিরাজি মিয়ার ছদ্মবেশে এক একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত মালিক

সাহেবের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। তবে সিরাজী মিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউ কারো দিকে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলো না, মিস শাম্মী অদ্ভুত এক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

ক্যাবিনের সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো শাম্মীর উপর।

ক্যাবিনের এক পাশে বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছে।

অতিথিবৃন্দ সবাই আসন গ্রহণ করেছেন।

আসনের সম্মুখের টেবিলে বয় খাবার এবং শরাবপাত্র সাজিয়ে রাখছে। ঝুড়িতে নানারকম ফলমূল রয়েছে। প্রত্যেকের সামনে একটি করে গোটা মুরগীর রোষ্ট। কাঁটা-চামচের প্লেটও দেওয়া হলো।

অতিথিবৃন্দ কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নিচ্ছেন।

টুনটান শব্দ হচ্ছে।

শাম্মীর পায়ের নূপুরধ্বনি হলো, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের বুকে এক অপূর্ব ঝঙ্কার উঠলো। শুরু হলো শাম্মীর নাচ।

অতিথিবৃন্দের কাঁটা-চামচের শব্দের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট আওয়াজ মিলে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করছিলো। শাম্মীর অপূর্ব নাচ অতিথিবৃন্দের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে যেন।

শাম্মীর দু'চোখে আবেগ মেশানো মধুর হাসি। নাচের তালে তালে চরণের নূপুরধ্বনি। ক্যাবিনে উজ্জ্বল নীল আলো জ্বলছে।

হঠাৎ আলো নিভে গেলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা আর্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো। সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। আলো জ্বলে উঠতেই দেখলো ওপাশে মহিষ আকার মালিক সাহেবের দেহটা নিচে পড়ে আছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে মেঝের মূল্যবান কার্পেটখানা।

আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাম্মীর নাচ থেমে গিয়েছিলো।

বাদ্যযন্ত্রীরাও বাজনা থামিয়ে ফেলেছিলো।

ক্যাবিনের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অতিথিগণের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতেই কাঁটা-চামচ থেমে গেছে খাবারসহ। হঠাৎ একি হলো!

মালিক সাহেবের প্রাণহীন দেহটা সোফার নিচে চীৎ হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা। তার বুকের একপাশে একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখলো ছোরার বাঁটখানা সোনার তৈরি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এলো। পুলিশ মহলের কর্মকর্তাগণ সবাইকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলো কিন্তু কে কোথা থেকে মালিক সাহেবের বুকে ছোরা বিদ্ধ করলো তার কোনো হদিস মিললো না।

সমস্ত হোটেলে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। মালিক নাদিরশাহ খুন—এ কম কথা নয়! পাকিস্তান সরকারের একজন বড় হাতের লোক ছিলেন তিনি। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কেমন যেন দূর সম্পর্ক ভাই হতেন মালিক সাহেব। পাকিস্তানের বাঙ্গালী নির্যাতনের একজন অধিনায়ক ছিলেন তিনি। তার একটি নয়, পাকিস্তানের কয়েকটি বন্দীশিবির আছে। এ সব বন্দীশিবিরে বহু বাঙ্গালীকে আটক করে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার মালিক নাদির শাহকে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা দেন এসব ব্যাপারে। কাজেই এহেন মৃত্যু পাক সরকারের বিরাট একটা ক্ষতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মালিক শাহের শোকে গোটা পাকিস্তানে শোকের হাওয়া বয়ে গেলো।

❑

বনহুর পত্রিকাখানা ভাঁজ করে পাশের টেবিলে রেখে চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলো। পত্রিকাখানায় মালিক নাদিরশাহের রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম খবর ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও একটি খবর ছাপা হয়েছে—যে ব্যক্তি নাদিরশাহের হত্যা কারীর সন্ধান দিতে পারবে বা হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে দিতে সক্ষম হবে তাকে দু'লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পত্রিকাখানা ছিলো ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে আছে, আপন মনেই বলে উঠে সে......সাতখানা আমি সঙ্গে এনেছিলাম, সবেমাত্র একখানা কাজে এলো......

পিছন থেকে কে যেন কাঁধে হাত রাখলো বনহুরের।

বনহুর সম্মুখে আয়নায় তাকিয়ে দেখলো শাম্মী তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। বললো শাম্মী—সাতখানা কি সঙ্গে এনেছিলেন মিঃ লিয়ন?

সত্যি শুনতে চাও?

হঁ।

ঐ যে আমার ব্যাগ দেখছো ওটা খুলে ফেললেই বুঝতে পারবে।

শাম্মী সঙ্গে সঙ্গে এগুতে গেলো ব্যাগের দিকে।

বনহুর ওর হাত ধরে ফেললো—ওতে কি আছে দেখবার পর তুমি এ ক্যাবিন থেকে ফিরে যেতে পারবে না শাম্মী।

কেন?

সে কথাও পরে জানতে পারবে।

সত্যি আপনি মাঝে মাঝে কেমন যেন আজগুবি কথা বলেন।

শাম্মী, আমি নিজেই তোমাকে দেখাবো, বসো।

বসলো শাম্মী।

বনহুর বললো—সেদিন তুমি অপূর্ব নেচেছিলে।

সত্যি বলছেন?

হাঁ, অদ্ভুত নেচেছো। পুরস্কার তোমাকে আজও দেওয়া হয়নি।

মিঃ লিয়ন আপনার ভাল লেগেছে আমার নাচ এটাই আমার পুরস্কার, অন্য কিছু আমি চাই না।

শাম্মী, সত্যি তুমি আমায় ভালবাসো, না?

হাঁ।

তুমি আজকের পত্রিকা পড়েছো?

হাঁ পড়েছি।

মালিক নাদিরশাহের হত্যাকারীকে যে ব্যক্তি ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দু'লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

হাঁ, পড়েছি।

যদি বলি আমিই সেই হত্যাকারী, তুমি দু'লাখ টাকার জন্য আমাবে কি ধরিয়ে দিয়ে ঐ টাকা গ্রহণ করতে পারো না?

হেসে উঠলো শাম্মী—যান, আপনি বড্ড যা তা বলেন হঠাৎ যদি ে শুনে ফেলে?

সত্যি, আমিই খুনী শাম্মী—

চুপ করুন। বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয় শাম্মী।

তুমি বিশ্বাস করছো না।

না—না।

তুমি কি দুই লাখ টাকা চাও না?

না।

আমি যদি সত্যি খুনী হই?

তবু পারবো না আপনাকে ধরিয়ে দিতে।

দু'লাখ টাকা চাও না?

না। দু'লাখ কেন, কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও আমি পারবো না আপনাকে......

শাম্মী!

হাঁ, আমি আপনাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার কাছে টাকার কোন মূল্য নেই।

শাম্মী......তুমি সত্যি অপূর্ব নারী। বনহুর ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে, তারপর বলে—আমি তোমাকে পেলে অনেক খুশি হবো। যা বলবো পারবে করতে শাম্মী?

বলুন পারবো।

শাম্মী, আমিই মালিক নাদিরশাহকে খুন করেছি!

আপনি!

হাঁ কিন্তু কেন করেছি সব তোমাকে বলবো। তবে এ হোটেলে নয়। কোনো নির্জন স্থানে তোমাকে সব বলবো। যাবে আজ আমার সঙ্গে?

যাবো।

বিশ্বাস করতে পারো আমাকে?

মিঃ লিয়ন, সত্যি বলছি আপনার সঙ্গে আমি যমালয়ে যেতে পারবো।

তাহলে আজ সন্ধ্যায় তুমি আর আমি.....

নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যার অন্ধকার গোটা লাহোরের উপরে নববধূর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। পথের ধারে লাইট-পোষ্টগুলো আলোর মালার মত এখনও জ্বলে উঠেনি। দোকানে-গাড়িতে-বাড়িতেও আলো জ্বলেনি। হোটেল গুলবাগের সামনে একটি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। কারো প্রতীক্ষায় তাকালো সামনের দিকে।

এমন সময় এগিয়ে এলো শাম্মী, হ্যালো মিঃ লিয়ন, আপনি গাড়ির পাশে আর আপনাকে আমি খুঁজছি আপনার ক্যাবিনে।

বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

শাম্মী উঠে বসলো গাড়ির মধ্যে ড্রাইভিং আসনের পাশে।

বনহুর গাড়ির সম্মুখ দিয়ে ঘুরে ড্রাইভিং আসনে বসলো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

সিকাগো রোড ধরে জাহাঙ্গীর রোডের দিকে গাড়ি ছুটে চললো। সম্মুখে হিম্‌সাহ পার্ক। পার্ক ছেড়ে গাড়ি এগুলো লেকের দিকে। হিমসাহ পার্কের দক্ষিণে একটি লেক। রাভী নদীর একটি শাখা শুকনো পাথুরিয়া মাটি খুঁড়ে এগিয়ে এসেছে হিমসাহ পার্কের দিকে।

লেকের ধারে নির্জন একটা জায়গায় গাড়ি এসে থামলো। নেমে পড়লো বনহুর, শাম্মী ও নেমে এলো গাড়ি থেকে।

বনহুর আর শাম্মী লেকের ধারে একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে পড়লো। চারিদিকে সম্পূর্ণ জনশূন্য প্রান্ত। সম্মুখে লেকের স্বচ্ছ সাবলীল জলধারা, কুলকুল করে বয়ে চলেছে। এই শুকনো মরুভূমির দেশে লেকভরা পানি সুন্দর দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করে চাঁদ উঠেছে পূর্বাকাশে। মহানগরী লাহোরে অসংখ্য বিজলীবাতির আড়ালে চাঁদ কোনোদিন নজরে পড়ে না। আজ শাম্মী প্রাণভরে চাঁদের দিকে তাকালো—ভারী সুন্দর!

কি সুন্দর? বললো বনহুর।

ঐ চাঁদটা। ঠিক আপনার মত সুন্দর মিঃ লিয়ন।

না না, ঠিক তোমার মত শাম্মী। পুরুষরা কোনো দিন চাঁদের মত সুন্দর হতে পারে না। পুরুষদের সৌন্দর্য বড় নীরস, মাধুর্যহীন.....

যা তা বলছেন আপনি। সত্যি মিঃ লিয়ন, জীবনে আমি বহু পুরুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু আপনার মত পুরুষ দেখিনি।

রূপে না গুণে?

দুটোকেই আপনি জয় করে নিয়েছেন মিঃ লিয়ন।

যাক ওসব কথা, এবার আসল কথায় আসা যাক। মানে যে কথার জন্য আমরা এখানে এসেছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় শাম্মী, তারপর বলে—বলুন?

শাম্মী, তোমার কাছে মানুষ বড় না জাতটাই বড়? যেমন ধরো বাঙ্গালী, বিহারী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইরানী, কাশ্মীরী অনেক রকম জাতের মানুষ আছে তো?

আমার কাছে মানুষ বড়?

তুমি অবাঙ্গালী, ধরো আমি যদি বাঙ্গালী হই; পারবে আমাকে ভালবাসতে?

মিঃ লিয়ন, আপনি যাই হোন না কেন, আমি আপনাকে ভালবাসবোই। তা ছাড়া আমার তো কোনো জাতবিচার করে লাভ নেই। কারণ আমাকে হোটেল গুলবাগে মানুষের মনস্তুষ্টির জন্যই রাখা হয়েছে। সেখানে নানা জাতের মানুষের আনাগোনা। সবাইকে খুশি করাই আমার কাজ......কথাগুলো খুব বেদনাভরা গলায় বলে শাম্মী।

বনহুর বুঝতে পারে শাম্মীর ব্যথা কোথায়, সান্ত্বনার সুরে বলে বনহুর—শাম্মী, তুমি নিজের জন্য ব্যথিত হচ্ছো কিন্তু আজ তুমি ভেবে দেখো তোমার মত কত মা-বোনদের উপর চালানো হচ্ছে জোরপূর্বক পাশবিক অত্যাচার। অগণিত বাঙ্গালী তরুণীকে বন্দীশিবির থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে, তাদের জাহাজে করে চালান দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। বিক্রি করা হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। যারা এই অসহায় তরুণীদের কিনে নিচ্ছে তারা এদের দিয়ে পয়সা উপার্জন করছে নানাভাবে। কেউ হোটেলে, কেউ ক্লাবে, কেউ অসৎ পল্লীতে গিয়ে পড়ছে। অমূল্য সম্পদ ইজ্জত বিকিয়ে তারা মালিকের ঐশ্বর্য আর অর্থ বাড়াচ্ছে। বলো শাম্মী, ভেবে দেখো একবার এদের অবস্থার কথা।

শাম্মীর গণ্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বলে সে—মিঃ লিয়ন, ঠিক আমার অবস্থাও আজকের বন্দীশিবিরে বাঙ্গালী তরুণীদের মত। আমার দেশ হলো ইরানে। আমি জন্মাবার পর আমার বাবা মরে যাওয়ায় মা আমাদের তিন বোন আর তিন ভাইকে নিয়ে খুব কষ্টে পড়লো। দিন আর যায় না, মা এক জুট মিলে কোনো একটা কাজ করার জন্য চাকরি পেলো। মাইনে সামান্য, তাতে সংসার চালানো মুস্কিল হলো। আমরা তখন বেশ বড় হয়ে গেছি। খাবার যা পাক হতো তাতে চলতো না। বেশি পরিশ্রমে মার শরীর ভেংগে পড়লো। মা কোনো কোনো দিন কাজে যেতে না পারলে আমাকে পাঠাতো। কথা বলতে বলতে থামলো শাম্মী, বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—দেখুন হঠাৎ আমার নিজের কথায় চলে গেছি, মাফ করবেন।

বনহুর বলে উঠলো—বলো শাম্মী, আমি তোমার জীবন কাহিনী শুনতে চাই?

আমার ঘৃণ্য জীবন কাহিনী শুনলে আপনার মন আমার প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠবে।

মোটেই না। বলো?

শাম্মীর চোখেমুখে একটা করুণ ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টি যেন চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে। বহুদিন আগের এক দিনে ফিরে যায় সে, বলে—মা সেদিন যেতে পারেনি তাই মায়ের পরিবর্তে আমি গেলাম মিলে কাজ করতে। কাজ করছি হঠাৎ একটা লোক এসে বললো, বড় সাহেব ডাকছেন।

আরও কয়েকবার বড় সাহেবের ঘরে গেছি মায়ের সঙ্গে। তাই বড় সাহেবের ঘর আমার পরিচিত ছিলো। হাতের কাজ রেখে গেলাম বড় সাহেবের ঘরে। ঘরে প্রবেশ করেই চমকে উঠলাম, বড় সাহেবের টেবিলে মদের বোতল আর গেলাস। আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো, জড়িত কণ্ঠে বললো—এসো জেরিনা। আমার নাম আগেই একদিন মায়ের কাছে জেনে নিয়েছিলো সে। আমি বড় সাহেবের চেহারা দেখে শিউরে উঠলাম। আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। হঠাৎ খপ করে আমাকে ধরে ফেললো বড় সাহেব। আমি চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু সেই পাষাণ দেয়াল ভেদ করে আমার চিৎকার বাইরে গেলো কিনা জানি না, কারণ কেউ এলো না আমাকে বাঁচাতে।

বনহুরের হাতখানা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে শুনে যাচ্ছে শাম্মীর জীবন কাহিনী।

শাম্মী বলে চলেছে—আমাকে ধরে নিয়ে পাশের কক্ষে গেলো বড় সাহেব। অনেক চেষ্টা করলাম নিজকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কিন্তু পারলাম না। আমকে যখন সে মুক্তি দিলো তখন আমার জ্ঞান আছে কিনা জানি না। বড় সাহেব আমার হাতে দু'খানা একশ'টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললো—যা।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তারপর?

আমি তখন সম্বিৎহারার মত ফিরে এলাম বাসায়। মায়ের হাতে দু'শ' টাকা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মা কি বুঝলো বা কি ভাবলো জানি না, দু'শ' টাকা হাতে পেয়ে তার চোখ দুটো খুশিতে জ্বলে উঠলো। অভাবী-অনাহারী মায়ের মুখে হাসি দেখে আমার কান্না থেমে গেলো। ভাবলাম এই বুঝি দুনিয়ার নিয়ম। বয়স কম থাকায় বুঝতে পারিনি সেদিন যা হারালাম তার কোনো মূল্য হয় না।

টাকার লোভে মা-ই আমাকে পাঠালো পরদিন।

আমি ভয় পেলেও খুব ঘাবড়ে গেলাম না। নিজকে শক্ত করে নিলাম বড় সাহেবের করাল গ্রাসকে সহ্য করার জন্য। বড় সাহেব আমাকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা।

আমার মায়ের অভাব আর রইলো না।

তারপর? প্রশ্ন করলো বনহুর।

তারপর একদিন মায়ের হাতে বহু টাকা তুলে দিয়ে আমাকে বড় সাহেব কিনে নিলেন একেবারে। এক বাংলোয় আমাকে রেখে দিলেন যত্ন করে। অভাব-অভিযোগের কথা ভুলে গেলাম। বড় সাহেব ইচ্ছামত আসতেন, কখনও কখনও দু'তিন জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসতেন সঙ্গে করে। সমস্ত রাত তারা আমার উপর চালাতো নির্যাতন। নাচগান সব শিখতে হলো তাদের মনস্তুষ্টির জন্য। বড় সাহেব আমার নাম দিলেন শাম্মী। আমাকে নিয়ে এলেন লাহোরে। সেই বড় সাহেবের এ হোটেল। এখনও আমি তার হোটেলে কাজ করি এবং মাসে পাই বিশ হাজার।

শাম্মী, আজ তুমি বড় সুখী, না?

সত্যি বিশ্বাস করুন আমি মোটেই সুখী নই।

কেন? একদিন যে শাম্মী বিশটা পয়সার জন্য উন্মুখ ছিলে, আজ সেই শাম্মী বিশ হাজার পাও......

পয়সায় মানুষ সুখী হয় না মিঃ লিয়ন। যে অমূল্য রত্ন ইজ্জত আমি হারিয়েছি আর কোনোদিন কি তা ফিরে পাবো? যত সুখীই লোকে আমাকে মনে করুক আমি বড় অসহায়, বড় ঘৃণার পাত্র।

না, তুমি ঘৃণার পাত্র নও শাম্মী। নিজের ইচ্ছায় নয়, শয়তান তোমাকে জোর করে নষ্ট করেছে, এজন্য তুমি ঘৃণার পাত্র নও। তুমি নিষ্পাপ, তুমি পবিত্র।

মিঃ লিয়ন!

হ্যাঁ শাম্মী। তুমি জানো না, বাংলাদেশের কত অসহায় নারীর উপর পাকিস্তানী বর্বর জল্লাদ সৈন্যবাহিনী পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। আজ সেই অসহায় মেয়েরা গর্ভবতী। চিন্তা করে দেখো এদের কি অপরাধ। জোর করে এদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে, তাহলে কি এরা দোষী? না, কখনোই না। এইসব মা-বোন অন্যান্য নারীর মতই নিষ্পাপ। শাম্মী, যে তোমার ইজ্জত নষ্ট করে তোমাকে আজ হোটেলের নাচনেওয়ালী সাজিয়েছে, বলো—

দেখিয়ে দাও তাকে, আমি তার উপযুক্ত সাজা দেবো। যেমনি দিয়েছি মালিক নাদিরশাহকে।

মিঃ লিয়ন!

হাঁ।, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

শাম্মী বললো—বড় সাহেব যেখানে থাকেন সেখানে কি করে আপনি যাবেন? কারো সাধ্য নেই সেখানে যায় বা তাকে স্পর্শ করে।

শাম্মীর কথায় হেসে উঠে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, সে হাসি যেন থামতে চায় না। নির্জন লেকের ধারে জ্যোছনাপ্লাবিত রাতটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শাম্মী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—শাম্মী, মনে রেখো লিয়নের অসাধ্য কিছু নেই। একটু থেমে বললো—শাম্মী, জানো আজ তোমাকে কেন এই নিভৃতে নিয়ে এসেছি।

জানি, আপনি কিছু বলবেন বলে......

হাঁ, শুধু বলবো নয়, তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি আমাকে ভালোবাসো সেই বিশ্বাসেই আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। তুমি সুন্দরী নারী, তাই পারবে......

বলুন কি করতে হবে?

যেতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে।

কোথা?

শিয়ালকোটে। শিয়ালকোটের রাজারবাগে কয়েকটি বন্দীশিবির আছে। ঐসব বন্দীশিবিরে প্রায় তিন শ' বাঙ্গালী তরুণী বন্দী অবস্থায় আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বিদেশে পাঠানো হবে। শাম্মী, এসব বন্দী তরুণীকে রক্ষা করতে হবে......একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো—এই বন্দীশিবিরগুলোর মালিক পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমি চাই তুমি তাকে ভুলিয়ে এই বন্দীশিবিরগুলোর সন্ধান জেনে নেবে এবং আমাকে জানাবে।

একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজারবাগ বন্দীশিবিরগুলোর মালিক?

হাঁ।

আমি জানি, সেই নরপশু প্রতিদিন এইসব বন্দীশিবিরে যায় এবং সুন্দরী তরুণীদের বাছাই করে নিয়ে আসে তার বিশ্রামাগারে। তুমি পারবে শাম্মী বন্দীশিবিরগুলোর সন্ধান দিতে?

শাম্মী একটু হাসলো।

বনহুর ওর একখানা হাত তুলে নিলো হাতের মুঠায়, বললো—শাম্মী, তারা বাঙ্গালী বলে তাদের প্রতি তুমি নির্দয় ব্যবহার করো না।

মিঃ লিয়ন, আপনাকে আমি বলেছি জাত আমি বুঝি না, মানি না। আমি মানুষকে ভালোবাসি। বাঙ্গালী হলেও তারা আমার বোন......

শাম্মী, জানি তুমি মহৎহৃদয় নারী জানি অর্থের মোহে তুমি কিছু করবে না, তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করবো...

আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনাকে স্পর্শ করে আমি বলছি, যথাসাধ্য সাহায্য করবো আপনাকে।

তুমি হোটেল গুলবাগ থেকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে নাও।

হাঁ, তাই নেবো। মিঃ লিয়ন, প্রাণ দিয়ে আমি বন্দী তরুণীদের মুক্তির চেষ্টা করবো!

শাম্মী! তুমি ঠিক ঐ চাঁদের মতই স্বচ্ছ। বড় সুন্দর তুমি, তোমার মনও বড় সুন্দর......বনহুর শাম্মীর চিবুকটা তুলে ধরে চাঁদের আলোয় দেখতে পায় তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি কাঁদছো?

না।

এই তো তোমার চোখে পানি। বলো তুমি কেন কাঁদছো শাম্মী? বলো?

মিঃ লিয়ন, এতোকাল সবাই আমাকে ভোগ করার জন্যই নানাভাবে আমার সৌন্দর্যের বর্ণনা করে এসেছে যাতে আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু আপনি নির্জনে পেয়েও কোনোদিন আমাকে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আপনার নিঃস্বার্থ প্রাণঢালা ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে, তাই নিজের অজ্ঞাতেই চোখে পানি এসে গেছে......আঁচলে অশ্রু মুছে বলে শাম্মী—চলুন এবার উঠা যাক।

চলো শাম্মী।

বনহুর আর শাম্মী অদূরে থেমে থাকা গাড়িখানায় উঠে বসলো।

রাজারবাগ নূরজাহান মহল। কথাটা বলে শাম্মী গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

পিছনের আসনে বসে আছে শাম্মী। তার দেহে আজ নতুন ধরনের পোশাক। কতকটা বিলেতী পোশাক বলা চলে। তার সুন্দর দেহে অপূর্ব মানিয়েছে পোশাকটা। মাথায় হাল্কা ধরনের ক্যাপ।

এ পথ সে পথ ঘুরে গাড়িখানা রাজারবাগের তেরো নম্বর রোড ধরে এগিয়ে চললো। রাজারবাগের এ অঞ্চলে শুধু ধনবান লোকদের বসবাস। এক একটা বাড়িকে রাজপ্রাসাদ বলা চলে।

প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে দারোয়ান বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির আশেপাশে নানারকম ঝাউ গাছ আর ফুলগাছের সমারোহ।

গাড়িখানা এসে থামলো এবার তেরো নম্বর রোডের নূরজাহান মহলের সম্মুখে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

শাম্মী নেমে পড়লো। হাল্কা হিলওয়ালা জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে এগিয়ে গেলো সে বাড়ির গেটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

শাম্মী এগিয়ে চললো। কিছুদূর এগুতেই আরও একটি গেট। দারোয়ান বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। শাম্মীকে দেখে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো শাম্মী।

আরও কিছু চলার পর দেখলো দু' জন বন্দুকধারী পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শাম্মী কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো।

দারোয়ান দু'জন পথ ছেড়ে দিলো।

শাম্মীর দেহে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

আরও কিছু চলার পর কোমরের বেল্টে রিভলভার ধারী সাদা পোশাক পরা দু'জন দারোয়ান শাম্মীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

শাম্মী এবার কথা বললো—আমির হোসেন নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করবো।

সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো দারোয়ানদ্বয়।

এগিয়ে চললো শাম্মী। যদিও তার মেন বিস্ময়ের শেষ নেই। জীবনে সে বহু দেখেছে, বহু ধনকুবেরের বাড়িতে সে গেছে কিন্তু এমন বাড়িতে সে কোনোদিন আসেনি বা যায়নি। এতো পাহারাবেষ্টিত বাড়িও সে দেখেনি কোনোদিন। প্রেসিডেন্ট ভবনেও বুঝি এমন সতর্ক পাহারা নেই।

শাম্মী আরও কিছু এগুতেই দেখলো বিরাট গাড়ি বারান্দায় দু'জন রিভলভারধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই তারা জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চান?

শাম্মী ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়ে উঠেছিলো, মুখে সাহস টেনে বললো—নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বললো একজন—এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যান।

শাম্মী তাকিয়ে দেখলো সম্মুখে একটি সিঁড়ি। সে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। সিঁড়ির মুখেই দু'জন পাহারাদার, তারা শাম্মীকে বাধা দিলো।

শাম্মী বললো—নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করবো।

পাহারাদারদের একজন একটা কলিং বেলে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দু'জন যুবতী এসে দাঁড়ালো।

পাহারাদারটি বললো—মালিকের সঙ্গে দেখা করবে এই মেয়েটি।

এরা সবাই উর্দুভাষী। আসলে শাম্মীও উর্দুতেই সব সময় কথাবার্তা বলে। বনহুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কথা বলে। পাকিস্তানে আসার পর বনহুর মিঃ লিয়নের বেশে সব সময় ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। সে যে বাঙ্গালী কেউ জানে না, জানবার কোনো উপায়ও নেই। শাম্মীও ভাল ইংরেজি জানে, কাজেই কোনো অসুবিধা হয় না।

যুবতীদ্বয়ক শাম্মীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

আরও উপরে একটি কক্ষের মধ্যে এসে তরুণীদ্বয় শাম্মীকে বললো—বসুন।

শাম্মী চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। বহু বাড়ি সে দেখেছে কিন্তু এমন বাড়ি শাম্মী কোনোদিন দেখেনি। কক্ষটার মধ্যে মূল্যবান সোফা, মূল্যবান টেবিল, মেঝেতেদ মূল্যবান কার্পেট বিছানো কিন্তু সব জিনিসের রং জমকালো। কক্ষমধ্যে একটি নীলাভো আলো জ্বলছে। নীলাভো আলোতে জমকালো জিনিসপত্রগুলো চক্‌চক্‌ করছে। সবচেয়ে অবাক হলো শাম্মী, কক্ষের মধ্যে কয়েকটি ত্রিপয়ার উপরে হিংস্র জীবজন্তুর মূর্তি। ভয়ঙ্কর হা করে আছে, দাঁতগুলো আশ্চর্য ধরণের। হিংস্র জীবগুলোর রংও জমকালো।

শাম্মী অবাক হয়ে দেখছে, হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর চমকে ফিরে তাকালো সে। দেখলো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঠিক দরজার মুখে। লোক তো নয় যেন একটা গরিলা। কতকটা হোটেল গুলবাগের মালিক নাদিরশাহের মত চেহারা, তবে ওর গায়ের রং মহিষের মত, এর গায়ের রং হাতির মত।

শাম্মী জানে না সে কতক্ষণ এই কক্ষে প্রবেশ করে এসব অবাক হয়ে দেখছিলো। হুশ হলো লোকটার কথায়—আপনি কাকে চান?; লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

শাম্মী ঢোক গিলে বললো—আপনি কি নিয়াজী সাহেব?

হাঁ, আমিই আমির হোসেন নিয়াজি। তা কি মনে করে এতোদূরে এসেছেন মিস সুন্দরী? লোকটা এবার এগিয়ে এলো।

শাম্মী শিউরে উঠলো।

আমির হোসেন নিয়াজীর চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস। শাম্মীকে দেখে সে অনেক আনন্দ লাভ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বললো—বসুন মিস সুন্দরী।

আমার নাম সুন্দরী নয়—মিস শাম্মী।

শাম্মী...মিস শাম্মী...চমৎকার নাম। বলুন এ অধমের কাছে কি প্রয়োজন?

আমির হোসেন যেন মোমের পুতুলের মত গলে গেলো।

শাম্মী ভয় পেয়ে গেলেও মুখোভাবে নিজকে সংযত রেখে কথা বলছে। বললো—আমি লাহোর গুলবাগ হোটেল থেকে এসেছি।

ও, আপনি হোটেল গুলবাগের সেরা সুন্দরী শাম্মী? আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনার সৌন্দর্যের কথা আমার মনে দাগ কেটেছে কিন্তু অনেক কাজের ঝামেলায় আজও আপনাকে স্বচক্ষে দেখতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হলো মিস শাম্মী। এবার বলুন কি আদেশ......

আমিও অনেক দিন আপনার নাম শুনেছি, আপনার গুণ ও সুনামের প্রশংসা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। তাছাড়া আপনি তো একজন মহাপুরুষ, আপনাকে নিজের চোখে দেখবো বলে এসেছি।

সত্যি বলছেন মিস শাম্মী?

সত্যি, আপনাকে আমি দেখতে এলাম কারণ আপনার গুণাগুণ শুনে শুনে আমার ধাঁধা লেগে গেছে। তাই এলাম আপনার সাক্ষাৎলাভ করতে।

আমার সৌভাগ্য মিস শাম্মী।

আমারও সৌভাগ্য। একটু থেমে বললো শাম্মী—মিঃ নিয়াজী, আপনার বন্দীশিবিরে কতগুলো বাঙ্গালী তরুণী আছে আমি একটু দেখতে চাই, কারণে আমাদের কয়েকটি তরুণী দরকার।

বেশ বেশ,অনেক তরুণী আছে— অপূর্ব সুন্দরী।

যত টাকা চান তাই পাবেন......

সে পরে হবে—আগে টাকার কথা নয় আগে মাল দেখুন।

হাঁ, আমি তাই দেখতে চাই। তবে কষ্ট করে যদি......

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...বলুন।

আমি এক্ষুণি যেতে চাই।

বেশ তো চলুন।

আমার গাড়ি সঙ্গে আছে, আপনি দয়া করে আমার গাড়িতেই চলুন। মিস শাম্মী কথাগুলো অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বললো।

মিঃ নিয়াজীর চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

শাম্মী ভ্যানিটি খুলে রুমালে মুখটা মুছে নেয়।

নিয়াজী বললো—চলুন আমি প্রস্তুত আছি।

শাম্মীর সঙ্গে যেতে মন তার খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। উঠে পড়ে বললো—চাবীর গোছা নিয়ে আসি।

শাম্মী বললো—চাবির গোছা! সে কি, চাবি আপনি রাখেন......

হাঁ মিস শাম্মী, তরুণীদের আমি বাছাই করে ভিন্ন এক বন্দীশিবিরে রেখেছি। তাছাড়া চাবি আমি নিজের কাছেই রাখি।

বুঝেছি, আচ্ছা চাবি নিয়ে আসুন।

মিঃ নিয়াজী ভিতরে চেলে গেলো, একটু পরে ড্রেস পরিবর্তন করে ফিরে এলো—সঙ্গে একটা বয়, হাতে তার বিরাট একটি চাবির গোছা।

শাম্মীসহ নিয়াজী নেমে এলো নিচে।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো ড্রাইভার।

নিয়াজী উঠে বসলো।

শাম্মীর ও তাকে অনুসরণ করলো।

গাড়ি কয়েকটা লৌহফটক পেরিয়ে বড় গেটে এসে থামলো।

শাম্মী বললো—এই তো আমার গাড়ি।

এবার শাম্মী নিজে নেমে দরজা খুলে ধরলো। নিয়াজী নেমে পড়লো। চাবির গোছাটা নিয়াজী গাড়িতে উঠবার সময় নিজের কাছে নিয়ে রেখেছিলো।

চাবীর গোছা নিয়ে নেমে পড়ে নিয়াজী সাহেব।

ততক্ষণে শাম্মীর গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে ধরেছে।

নিয়াজী তার বিশাল বপু নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। শাম্মী বসলো তার পাশে।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ চলার পর বললো শাম্মী—নিয়াজী সাহেব, আমার কতবড় সখ আপনার সবগুলো বন্দীশিবির দেখি।

বেশ তো, এটা আমার খুশির কথা। এবার নিয়াজী পথের নির্দেশ দিলো।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চললো। তার দৃষ্টি শুধু সম্মুখে।

শাম্মী আর নিয়াজীর মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো সব কান পেতে শুনছিলো ড্রাইভার।

একটা নির্জন পথ ধরে গাড়িখানা এখন এগিয়ে চলেছে। এ পথে তেমন কোনো যানবাহন চলাচল করছে না। পথটা অত্যন্ত প্রশস্ত।

ড্রাইভার আমির হোসেন নিয়াজীর নির্দেশমতই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

একটা পোড়োবাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো।

নিয়াজী সাহেব এবার নেমে পড়লেন।

শাম্মীকে নামবার জন্য বললেন এবার তিনি।

শাম্মীও নামলো।

নিয়াজী হাত বাড়ালেন ওর হাতখানা ধরবার জন্য। শাম্মী আলগোছে হাতখানা এগিয়ে দিলো।

দু'জন হাত ধরে অতি আপন জনের মত পোড়োবাড়িখানার দিকে এগুলো। শাম্মী বললো—এটা বুঝি আপনার.......

হাঁ, আমার এক নম্বর বন্দীশিবির।

দরজায় পৌঁছতেই একটা পাঞ্জাবী দারোয়ান দরজা খুলে দিলো।

হোসেন নিয়াজী আর শাম্মী এগিয়ে গেলো ভিতরের দিকে।

কিছুটা চলার পর শাম্মী দেখলো বিরাট একটা কক্ষের দরজায় প্রচন্ড একটি তালা লাগানো রয়েছে।

নিয়াজী সাহেব নিজের চাবীর গোছা বের করে চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলে। দরজা খুলতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তা হৃদয়বিদারক। শাম্মীর দু'চোখ বিস্ময়ে ভরে উঠলো, সে দেখতে পেলো কতগুলো তরুণী সেই কক্ষমধ্যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। দরজা খোলা হতেই তরুণীরা দু'হাতের আড়ালে উন্মুক্ত বক্ষ ঢেকে রাখার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো। দীর্ঘ

কয়েক মাস এরা বন্দী থাকা অবস্থায় জামা-কাপড় এদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এতোটুকু ন্যাকড়া দিয়ে দিয়ে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করেছে। রুক্ষ চুল, কোটরাগত চোখ। চুলগুরো যেন জটা ধরে গেছে একেবারে!

আমির হোসেন নিয়াজী শাম্মীকে লক্ষ্য করে বললো—দেখুন কোন্ মেয়েগুলো আপনার পছন্দ হয়?

শাম্মী সবাইকে তীক্ষ্ম নজরে দেখলো, তারপর বললো—আপনার প্রত্যেকটা বন্দীশিবির দেখ্তে চাই, কতগুলো বাঙ্গালীকে আপনার লোক আটক করতে সমর্থ হয়েছে।

এ তো খুশির কথা, চলুন আপনাকে আমার সব কয়টা বন্দীশিবির দেখাবো। বাঙ্গালী বাচ্চাদের আমি উচিত সাজা দিচ্ছি। এক নম্বর দেখলেন, এবার দু'নম্বর শিবিরে চলুন।

এক নম্বর শিবির থেকে দু' নম্বরে যাবার জন্য মিস শাম্মী ও আমির হোসেন নিয়াজী গাড়িতে চেপে বসলো। নিয়াজী সাহেব ড্রাইভারকে ঠিকানা বললো।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

ঘন্টাখানিক চলার পর একটা বিরাট বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়ি থামলো। বাড়িখানা ঠিক পোড়াবাড়ীর না হলেও নতুন ঝকঝকে নয়। ইট্ জিরজিরে দাঁত বের করা দেয়াল। মস্তবড় প্রাচীরে বাড়িখানা ঘেরাও করা রয়েছে। দরজায় গাড়ি থামতেই নেমে পড়লো আমির হোসেন। শাম্মীও নেমে পড়লো।

দরজার কাছে এগুতেই একজন লোক দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো।

আমির হোসেন নিয়াজী শাম্মীকে লক্ষ্য করে বললো—ভিতরে আসুন।

আমির হোসেনকে অনুসরণ করলো শাম্মী।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো শাম্মী, এটা আসলে বাড়ি নয়—একটা গুদাম। সম্মুখে কতকগুলো ছোটবড় ঘর তারপর বিরাট প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গনের পর একটা মস্তবড় প্রশস্ত গুদামঘর। আমির হোসেন নিজে চাবি দিয়ে গুদামকক্ষের দরজা খুলে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য শাম্মীর নজরে পড়লো সে অতি মর্মান্তিক।

দেখালো শাম্মী, কতকগুলো যুবক-বৃদ্ধ এবং শিশু-বালক-বালিকা একত্রে এই গুদামে বস্তা বোঝাইয়ের মত করে আটকে রেখেছে। জীর্ণশীর্ণ

কঙ্কালসার চেহারা, মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া বিদ্যমান। একসঙ্গে এতোগুলো লোকের এই করুণ অবস্থা শাম্মীর চোখে পানি এনে দিলো।

নিজকে সামলে নিয়ে বললো শাম্মী—চলুন এর পরের বন্দী শিবিরটা দেখতে চাই।

চলুন।

পরপর কয়েকটা বন্দীশিবির দেখে ফিরে চললো শাম্মী সেদিন, আমির হোসেনের কাছে আবার আসবে বলে বিদায় নিয়ে।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

শাম্মী বসে আছে পিছন আসনে।

একটা নির্জন পথ ধরে গাড়ি চলছিলো, সহসা গাড়ি থেমে পড়ে।

শাম্মী বলে—ড্রাইভার, গাড়ি রুখলে কেন?

এবার ড্রাইভার তার মুখ থেকে গোঁফ ও দাড়ি খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে শাম্মী—মিঃ লিয়ন, আপনি!

হাঁ, আমিই তোমার সঙ্গী হিসাবে ড্রাইভার বেশে ছিলাম। ধন্যবাদ শাম্মী, যে কাজের জন্য আমি তোমাকে এ কষ্ট স্বীকারে বাধ্য করেছিলাম, সে কষ্ট স্বীকার তোমার সার্থক হয়েছে। আমির হোসেনের বন্দীশিবিরগুলোর ঠিকানা আমার আগে থেকেই জানা ছিলো।

শাম্মীর দু'চোখ থেকে বিস্ময় তখনও কাটেনি, বলে শাম্মী—সত্যি আপনি অদ্ভুত মানুষ। আমি আপনাকে একটুও চিনতে পারিনি।

শাম্মী, তোমার সাহায্য আমার একান্ত কামনা।

মিঃ লিয়ন আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজকে ধন্য মনে করবো।

পথে তেমন কোনো আর কথা হলো না।

❑

—রহমান, সব প্রস্তুত হয়েছে তো?

—হাঁ সর্দার।

—খাবার পানি ও খাবার প্রচুর পরিমাণ নিয়েছো?

—নিয়েছি।

আজ ভোর রাতেই জাহাজ ছাড়বে, বুঝলে?

বুঝেছি সর্দার।

রাত তিনটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দেবে। সমস্ত বন্দর যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। রহমান, তুমি থাকবে জেটিতে আর কায়েস থাকবে জাহাজে। জাহাজের সিঁড়ি নামানো থাকবে, বন্দীরা জাহাজে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়বে।

হাঁ সর্দার, আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই কাজ হচ্ছে।

তবু আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম কোনো রকম যেন ভুল না হয়। কাওসার, হারুন, আহসান, রামসিং এরা সবাই যেন প্রস্তুত থাকে রহমান?

বলুন সর্দার?

এরা সবাই গাড়ি পেয়েছে তো?

হাঁ সবাই গাড়ি সংগ্রহ করে নিয়েছে। মিস্ শাম্মীই গাড়ি গুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে সর্দার।

বেশ ভালো। কিন্তু শাম্মীকে আজ সমস্ত দিন খুঁজেও পাইনি।

রহমান বললো—মিস শাম্মী তার মালিকের গাড়িগুলো চেয়ে নিয়েছিলো তার কোনো এক বান্ধবীর বিয়ের ব্যাপারে গাড়ির দরকার জানিয়ে। হয়তো মিস শাম্মী তাই সরে গেছে সবার সম্মুখ থেকে।

বনহুর একটু হেসে বললো—ভালোই বুদ্ধি করেছে মেয়েটি।

রহমান বললো—সর্দার, কি বলবো মিস শাম্মী যেভাবে আমাদের সহায়তা করে চলেছে তাতে আমরা বিস্মিত। একটি অবাঙ্গালী মেয়ে হয়ে বাঙ্গালী বন্দীদের উদ্ধারের জন্য যেভাবে চেষ্টা করছে সত্যি প্রশংসনীয়।

হাঁ, ক'দিনের পরিচয় ওর সঙ্গে তবু ওকে দেখলে মনে হয় যেন কতদিনের পরিচিত। তাছাড়া ও আমাকে বাঙ্গালী বন্দীদের উদ্ধার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছে। আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ আচ্ছা এখন তুমি যাও, সব খেয়াল রেখে হুঁশিয়ারির সঙ্গে কাজ করবে। রামসিং গাড়িগুলোকে পরিচালনা করবে। প্রথম আমি আমির হোসেনের এক নম্বর বন্দী শিবিরের বন্দীদের মুক্ত করবো। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ......

যাও, তোমরা হুঁশিয়ার থেকো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

❑

গভীর রাত্রি।

শিয়রে একটানা টেলিফোন বেজে চলেছে।

ঘুম ভেংগে যায় আমির হোসেন নিয়াজীর।

দড়বড় বিছানায় উঠে বসে রিসিভার তুলে নেয় হাতে—হ্যালো স্পিকিং আমির হোসেন নিয়াজী। ......

ও পাশ থেকে ভেসে আসে তার একনম্বর বন্দীশিবির থেকে প্রধান শিবিররক্ষীর কণ্ঠস্বর......মালিক আপনি এক্ষুণি চলে আসুন, আমাদের বিপদ ঘটেছে......

নিয়াজীর নিদ্রাঘোর মুহূর্তে কেটে গেলো, বলে উঠলো...... বিপদ... বিপদ...... কি বিপদ......

কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো উত্তর ভেসে এলো না।

নিয়াজী দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে নেমে পড়লো। কলিং বেলে চাপ দিতেই কক্ষের চারপাশ থেকে চারজন দেহরক্ষী ছুটে এলো। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

নিয়াজী নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতো, তাই সে নিজের শয়নকক্ষের চারপাশে চারজন দেহরক্ষী সদা-সর্বদা পাহারা রাখতো। ভয় ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ যদি তাকে হত্যা করে।

দোষী বা শয়তান লোকদেরই এমনি একটা ভীতিভাব থাকা স্বাভাবিক, নিয়াজীরও ছিলো। দেহরক্ষীরা ছুটে আসতেই নিয়াজী বললো—তোমরা আমাকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। একনম্বর বন্দীশিবিরে যেতে হবে।

দেহরক্ষীদের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

হঠাৎ বন্দীশিবিরে কেনো মালিক? একজন দেহরক্ষী জিজ্ঞাসা করে বসলো।

নিয়াজী ব্যস্তকণ্ঠে বললো—কেনো বিপদ ঘটেছে সেখানে তাই যেতে হবে। তোমরা আমাকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জামাটা পরে নিলো নিয়াজী। চাবির গোছাটা সঙ্গে নিতে ভুললো না সে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে গাড়ি বারেন্দায় অপেক্ষা করছে। নিয়াজী নেমে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

নিয়াজী চেপে বসলো গাড়িতে।

দেহরক্ষী চারজন লম্বা সেলুট ঠুকে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

জনহীন রাজপথ।

উল্কাবেগে গাড়ি ছুটছে।

নিয়াজী বললো—এক নম্বর বন্দীশিবিরে চলো।

ড্রাইভার বললো—জ্বি হাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এক নম্বর বন্দীশিবিরের নিকটে পৌছে গেলো।

গাড়ি দরজায় পৌছলে নেমে পড়লো ড্রাইভার এবং সে নিজের হাতের গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

নিয়াজী সাহেব নেমে দরজার দিকে এগুলো।

বন্দীশিবিরের দরজা উন্মুক্ত দেখে বললো নিয়াজী—দরজা এমন খোলা কেন? দারোয়ান বেটা গেলো কোথায়?

ড্রাইভার ঠিক পিছনেই ছিলো, বললো—আপনি আসবেন বলে খোলা আছে। আর দারোয়ান বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে?

একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠলো নিয়াজী সাহেবের, ঘেমে উঠছে সে ক্রমান্বয়ে। প্রায় একরকম ছুটেই চললো নিয়াজী সাহেব তার বিশাল বপু নিয়ে।

যতই এগুচ্ছে ততই হৃৎপিণ্ড তার ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। সমস্ত বন্দীশিবির পাহারাহীন। একজন পাহারাদারকেও তার নজরে পড়লো না, সব গেলো কোথায়! দু'একবার হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো সে। বন্দীশিবিরের দরজায় পৌছে দেখতে পেলো, দরজায় তালা ঝুলছে। কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলো সে প্রাণে। যেমন সে ফিরে প্রধানরক্ষীর কক্ষের দিকে এগুতে যাবে অমনি ড্রাইভার বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল তার পিছন থেকে জামার কলারটা।

নিয়াজী চমকে পিছন ফিরতেই ড্রাইভার বলে উঠলো—কেউ নেই। আপনি কাউকেই খুঁজে পাবেন না। কোনো রকম চিৎকার করেও ভাল হবে না।

ড্রাইভার! নিয়াজী বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠলো।

ড্রাইভার নাকের তলা থেকে গোঁপজোড়া খুলে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ীটাও খুলে ফেলে সে।

নিয়াজীর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠে, গলা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। এ তো তার ড্রাইভার নয়, সুন্দর সুপুরুষ এক বলিষ্ঠ মুখ তার সম্মুখে ভেসে উঠে। নিয়াজী বলে উঠে—কে তুমি?

বললো ড্রাইভার—আমি একজন বাঙ্গালী! কথা শেষ হতে না হতেই নিয়াজীর বুকে চেপে ধরলো সে রিভলভার। কঠিন কণ্ঠে বললো—বন্দীখানার দরজা খুলে দাও।

ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছে নিয়াজীর মুখ, অমন একটা বিপদে পড়বে ভাবতেও পারেনি সে। নিয়াজীর দেহটা ঘেমে ভিজে চুপসে গেছে। ভীত দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলো সে ড্রাইভারে হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে।

ড্রাইভার দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এক মুহূর্ত দেরী করো না, খুলে দাও বন্দীশিবিরে দরজা।

এবার নিয়াজী বাধ্য হলো বন্দীশিবিরে দরজা খুলে দিতে।

ড্রাইভার পকেট থেকে হুইসেল বের করে ফুঁদিতেই একজন এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার বললো—রামসিং, বন্দীদের নিয়ে যাও। তারপর বন্দীখানায় প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার মাথাটা আপনা আপনি নত হয়ে এলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বনহুর।

এই বন্দীশিবিরের ছিলো শুধু মহিলা।

এরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। পুরুষ লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলো। দু'হাতে বুক ঢেকে ফেলেছে অনেকেই।

ড্রাইভার এবার বন্দিনী মহিলা ও তরুণীদের লক্ষ্য করে বললো—আপনারা এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসুন। বাইরে আপনাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে, আপনারা গিয়ে গাড়িতে বসুন। আজ আপনাদের আমি মুক্ত করতে এসেছি......

ড্রাইভারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বন্দীশিবিরের মালিক আমির হোসেন নিয়াজী। ড্রাইভারের কথাগুলো তার কানে পৌঁছতেই তার মুখখানা হিংস্র

জন্তুর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। কিন্তু ড্রাইভারের হাতের রিভলভারখানার জন্য সে কিছু বলতে সাহসী হচ্ছে না।

প্রথমে বন্দী মহিলারা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না তারা ওদের কথাগুলো। কারণ তারা জানে, ঐ ভয়ঙ্কর চেহারার নিয়াজী সর্দার কত সাংঘাতিক লোক। ও প্রতিরাতে এই বন্দীশিবিরে এসে কত নারীকে নিয়ে গেছে এবং তার উপরে চালিয়েছে পাশবিক নির্যাতন। যখন তাকে এই বন্দীশিবিরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তখন তার অবস্থা অবর্ণনীয়। আজও তাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য ভাব নিয়ে তাকায় ওরা ড্রাইভার ও পাশে দাঁড়ানো নিয়াজীর মুখের দিকে। অল্পক্ষণেই মহিলারা বুঝতে পারে নিয়াজী এক্ষণে পিয়াজী বনে গেছে, কারণ একটা কথা বলতে পারছে না, তাছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে উদ্যত রিভলভার—নিশ্চয়ই সে নিয়াজীকে কাবু করে ফেলেছে।

ড্রাইভার পুনরায় বললো—আপনারা বিলম্ব করবেন না—শীঘ্র বেরিয়ে পড়ুন। বাইরে আপনাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।

এবার মহিলাগণ লজ্জা শরম ভুলে যে যেমন ছিলো তেমনি জলস্রোতের মত হু হু করে বেরিয়ে এলো বন্দীশিবির থেকে।

বাইরে অপেক্ষা করছিলো কয়েকখানা গাড়ি।

রামসিং সেই গাড়িগুলোতে মহিলাদের তুলে নিলো।

ওদিকে আমির হোসেন নিয়াজীসহ ড্রাইভার নিয়াজীর গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভার রামসিংকে বললো—তোমরা ঠিকমত বন্দী মহিলাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গাড়ি দু'নম্বর বন্দী শিবিরে নিয়ে আসবে, আমি নিয়াজী সাহেবসহ সেখানে অপেক্ষা করবো।

রামসিং সেলুট দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো এবার। নিয়াজীর মুখে কোনো কথা নেই। সে যেন বোবা বনে গেছে। সে ভাবতেও পারেনি শিয়ালকোটে এমন কেউ আছে যে তাকে কাবু করতে পারে। তাকে কৌশলে বাড়ি থেকে বের করাটাও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আমির হোসেন নিয়াজী নিজের কানে শুনেছে তার একনম্বর বন্দীশিবির থেকে প্রধান রক্ষীর ভীত কণ্ঠস্বর। তাকে

শীঘ্র চলে আসার জন্য বলেছিলো সে, বলেছিলো বিপদে পড়েছে। কিন্তু এসে তার সাক্ষাৎ পায়নি, সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ লোকটাকে যে তাকে তারই নিজস্ব ড্রাইভারের বেশে গভীর রাতে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। উদ্দেশ্য তারই দ্বারায় বন্দীদের মুক্ত করা এটাও নিয়াজী বুঝে নেয় ভালভাবে। নিয়াজী আরও বুঝে নিয়েছে, কোনো রকম প্রতিবাদ করে কোনো ফল হবে না। ড্রাইভার যেই হোক সে কম লোক নয়, আরও একটি ভয় তার হাতে রিভলভারখানা। আর সেই কারণেই নিয়াজী ঠিক পিয়াজী বড়ার মত মুখ চুপসে বসে ছিলো। অবশ্য তার মাথার মধ্যে নানা রকম মতলব উঁকি দিচ্ছিলো, কেমন করে এই লোকটাকে কাহিল করে পালাবে সে।

কিন্তু পালানো তার হলোনা, নিয়াজীর দু'নম্বর বন্দীশিবিরে গিয়ে হাজির হলো গাড়িখানা।

ড্রাইভার রিভলভার তুলে নিলো হাতে তারপর বললো—নেমে পড়ুন মিঃ নিয়াজী।

নিয়াজী নেমে পড়তে বাধ্য হলো।

এটা নিয়াজী সাহেবের দু'নম্বর বন্দীশিবির।

ড্রাইভার নিয়াজীসহ বন্দীশিবিরে প্রবেশ করলো। নিয়াজীর চোখেমুখে ভয়-বিস্ময়, চারিদিকে তাকাতে লাগলো সে ফ্যাল ফ্যাল করে। এখানেও প্রথম বন্দীশিবিরের মতই অবস্থা কোথাও কোনো পাহারাদার নেই একটি লোকও নেই, তার কর্মচারীদের মধ্যে।

ড্রাইভার বললো—চলুন ভিতরে চলুন।

কম্পিত পদক্ষেপে এগুলো নিয়াজী।

বন্দীশিবিরের তালা খুলে দিলো নিয়াজী নিজের হাতে।

ড্রাইভার বন্দীদের বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানালো।

বন্দীশিবিরের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। বাঙ্গালী বন্দী নারী-পুরুষ সবাই উন্মাদের মত মরিয়া হয়ে ছুটো-ছুটি করে গাড়িতে এসে উঠে পড়লো। মুক্তির আনন্দে সবাই যেন দিশেহারা।

❑

শিয়ালকোটের ধনকুবের আমির হোসেন নিয়াজীর লাশ গেলো লাহোরের সবচেয়ে বড় মিউজিয়ামের এক উল্লেখিত জায়গায়। মৃতদেহটির গলায় ঝুলছে একটি। কাগজের টুকরা। তাতে লিখা আছে "বাঙ্গালী নির্যাতনকারীর উপুক্ত সাজা" মৃত নিয়াজীর দেহের চামড়া সরু ছুরি দ্বারা চিরে চিরে ফেলা হয়েছে। চোখের মধ্যে দুটি লৌহ শলাকা প্রবেশ করানো রয়েছে। লৌহশলাকা দুটি দেখলে মনে হয় এক সময় শলাকা দুটি অগ্নিদগ্ধ ছিলো। চোখের চারপাশ পুড়ে সাদা হয়ে গেছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখখানা। নিয়াজীকে যে চরম শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা তার মৃতদেহ দেখলেই বোঝা যায়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, লাশটি কি করে লাহোর মিউজিয়ামে গেলো? কার এমন সাহস এমন দুঃসাধ্য কাজ করে। সমস্ত লাহোরে এ ব্যাপার নিয়ে ভিষণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পত্রিকায় ছাপা হয় এ ঘটনাটি নানা ভাবে।

বনহুর তার ক্যাবিনে বসে দৈনিক পত্রিকাখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। পত্রিকাখানা বাংলা বা উর্দূ নয়, ইংরেজী সংবাদ পত্র।

বনহুর যখন পত্রিকায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে তখন শাম্মী এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

চোখ তোলে বনহুর—শাম্মী!

হাঁ মিঃ লিয়ন।

এ ক'দিন কোথায় ছিলে শাম্মী?

মালিকের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলাম, কারণ......

কারণ আমাকে বলতে হবে না শাম্মী, আমি সব জানি এবং সেজন্য তোমাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ।

শাম্মী বনহুরের পাশে বসে পড়লো। আজ তাকে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি খুশি মনে হচ্ছে। সুন্দর গোলাপী ড্রেসে অপূর্ব লাগছে।

বনহুর মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শাম্মীর মুখের দিকে। এক সময় শাম্মীর হাতখানা তুলে নিলো বনহুর নিজের হাতের মুঠায়। গভীর আবেগে

বললো—শাম্মী, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ......তোমার সহায়তা না পেলে আমি হয়তো মৃত্যুমুখী এতোগুলো বাঙ্গালী বন্দীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম না।

শাম্মী বললো—মিঃ লিয়ন, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে সত্যি আমি নিজেও আনন্দিত। শাম্মী অতি সংযতভাবে কথাটা বলে নিজের হাতখানা বনহুরের হাতের মধ্য থেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো—আজকের মত চলি।

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় শাম্মী।

বনহুরের মুখে মৃদু একটা হাসির আভাস ফুটে উঠে। সংবাদপত্রখানা হাতে তুলে নেয় সে পুনরায়। মনে তার নানা চিন্তার উদয় হতে থাকে। আশ্চর্য মেয়ে শাম্মী। একে যত দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে বনহুর। অবাঙ্গালী হয়েও তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর বাঙ্গালী দরদী মনোভাব। তাছাড়াও শাম্মীর মধ্যে বনহুর এক নতুন নারীকে আবিষ্কার করেছে। তার রূপ-যৌবন সব তো এই হোটেলবাসীদের জন্য, কিন্তু বনহুরের কাছে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। বনহুর অনেক পরীক্ষা করেও শাম্মীর চরিত্রে অসংযত কোন লক্ষণ সে দেখতে পায়নি। সে দেখেছে এক পবিত্র নারী প্রাণ।

শাম্মীকে বনহুর তাই ঘৃণা করতে পারেনি বরং একটা অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করেছে সে নিজের মনে।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, পিছন ফিরতেই দেখতে পায়, সমস্ত শরীরে সাদা ধবধবে আলখেল্লা পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'হাতে দু'টি পিস্তল।